

হাসির গল্পের সঙ্কলন

সম্পাদক

শ্রী গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু

দি বুক এম্পোরিয়াম লিমিটেড,
কলিকাতা

হাসির গল্পের সঙ্কলন

প্রথম সংস্করণ মহালয়া ১৩৫২

দাম : দু' টাকা

দি বুক এম্পোরিয়াম লিমিটেড, ২২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ও বোস প্রেস
হইতে শ্রীমোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত।

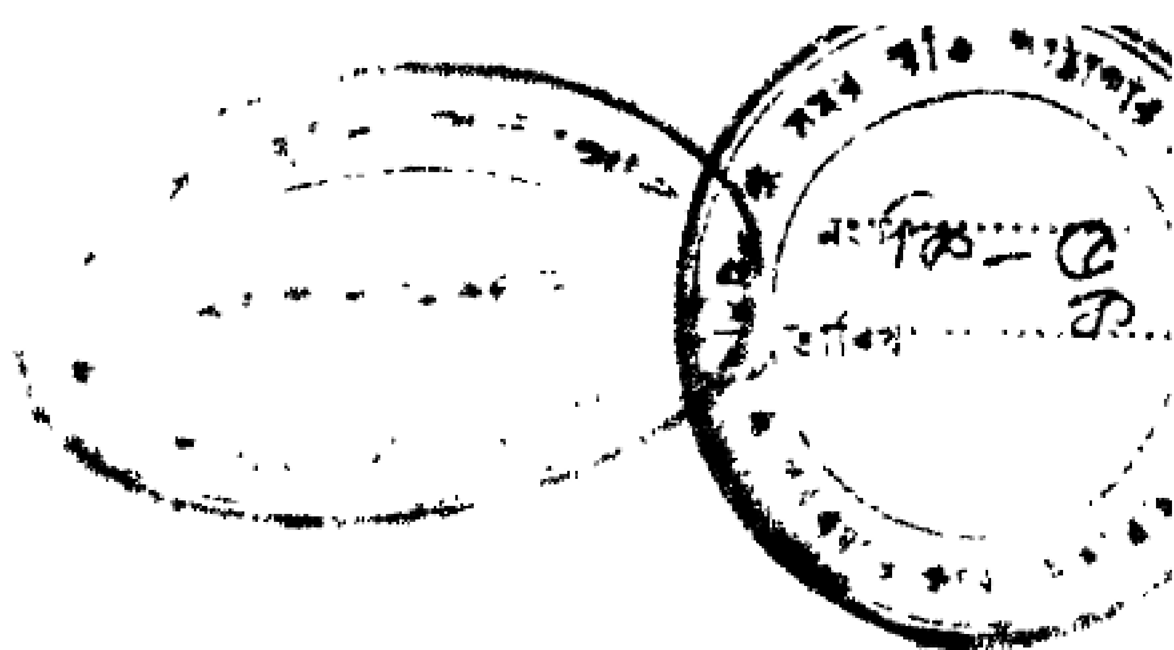
ভূমিকা

শিশু-সাহিত্যের প্রধান উপকরণ রূপকথা। তারপরই দুঃসাহসিক ও অভিযানের কাহিনীতে কিশোর-সাহিত্যের সুরু। শিশু-সাহিত্য থেকে কিশোর-সাহিত্যের পথটা ছিল সহজ এবং সরল। কিন্তু কৈশোর থেকে বয়স্ক পাঠকত্বে প্রবেশ অতটা সহজ নয়—কিম্বা সহজ হলেও সমতল নয়। সাহিত্যের সঙ্গে যদি সত্যের সম্পর্ক না থাকে তবে তা সাহিত্যই নয়। এই সত্য হল বাস্তব এবং প্রায়শ-ই রূঢ়। তার প্রবেশ পথ হল অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা থেকেই আসে জীবনদর্শন। এই অভিজ্ঞতার বিষে নীলকণ্ঠ হয়ে সাহিত্যের রসগ্রহণ করতে হয়। জীবনকে আঁকড়ে ধরে বোঝা না করে নির্লিপ্তভাবে বোঝবার এই হচ্ছে মন্ত্র। রসজ্ঞান প্রখর ও প্রবল, কিম্বা প্রখরতর ও প্রবলতর হলে পৃথিবীর কোন কিছু থেকেই রসগ্রহণে আর বাধা থাকে না! সত্যিকার রসিকের কাছে অশ্বত্থবৃক্ষ সর্বদাই রসিক—বয়সের চোখে বা অভিজ্ঞতায় ঠকে কখনই শোষক মনে হবে না। আর এই রসিক মনোভাবেই আছে সার্থক জীবনদর্শন—সত্যকার পরমহংসভাব।

এই কথাগুলি একটা বইয়ের ভূমিকায় লেখা আছে।

ভাল ভাল কথা। ভূমিকায় এ ধরণের কথা থাকা ভাল। বেশ মানায়। তবে কথাগুলি হাসির নয়। এই সঙ্কলনে ছাপা বলেও নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, ত্রৈলোক্যনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যরথীদের সর্বকালের হাসির গল্প পড়ার সাথে সাথে যদি এই ভূমিকা পড়েও হাসতে পারি—তবেই না বাহাদুর! তবে শরৎচন্দ্রের যে গল্প রয়েছে সেটা তাঁর লেখা হলেও—তাঁর গল্প নয়। এই গল্প তাঁর শ্রীকান্ত উপন্যাসের কয়েকটি লাইন মাত্র—এই গ্রন্থে গল্পচ্ছলে সঙ্কলিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাস যখন কয়েকটা লাইনে শেষ নয়—তখন বুঝতেই পারছ কি পরিমাণ হাসির খোরাক তিনি লিখে রেখে গেছেন--তাঁর উপন্যাসের মধ্যে—এখানে সেখানে ছড়িয়ে—শুধু তোমার আমার কুড়িয়ে নেবার জন্য—পড়ে প্রাণভরে হাসবার জন্য।

গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু



সূচীপত্র

* 'শ্রীকান্ত' প্রথম খণ্ড থেকে মুদ্রিত

* সিগনেট প্রেসের সৌজন্যে 'পাগলা দাশু' থেকে মুদ্রিত



* দেব-সাহিত্য কুটীরের সৌজন্যে 'শোনো মন দিয়ে' থেকে মুদ্রিত

† আরতি এজেন্সীর সৌজন্যে 'গুজবের জন্ম' থেকে মুদ্রিত

* 'ভ্রমণ ও কাহিনী' থেকে মুদ্রিত

ই-গ্রুপ আর্টিষ্ট্‌স্‌এর শিল্পীরা এই সঙ্কলনের সব ছবি এঁকেছেন।

কমলাকান্তের জোবানবন্দী



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেই আফিঙখোর কমলাকান্তের অনেক দিন কোন সংবাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রতি একদিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম, আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিঙ চুরি করিয়াছে—অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবে না, ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে একজন কালকোর্তা কন্‌ষ্টেবল দেখিলাম। আমি দাঁড়াইলাম না, কি জানি, যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে কাণ্ডটা কি হয়।

কিছুকাল পরে কমলাকান্তের ডাক পড়িল। তখন একজন কন্‌ষ্টেবল রুল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজলাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজ্‌লাসের প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডেপুটী। কমলাকান্ত-আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গোরু চুরি; ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটরায় পুরিয়া দিল।

তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাসী ধমকাইল —"হাস কেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে আমাকে এর ভিতর পুরিলে?"

চাপরাসী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না, দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাসার জায়গা এ নয়, হলফ পড়।"

কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল' "বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া—"

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব ?

মুহুরি। শুনতে পাও না—"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্বনাশ!

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্বনাশ কি ?"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি, এ কথাটা বলতে হবে ?

হাকিম। ক্ষতি কি ? হলফের ফারমই এই।

কমলা। হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম, কিন্তু গোড়াতে একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব সেটা কি ভাল ?

হাকিম। এর আবার মিথ্যা কথা কি ?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, "তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ 'পদবৃদ্ধি' হইত ?" প্রকাশ্যে বলিল, "ধর্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষেই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয়, আইনের চশমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন—কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না—তখন কেমন করিয়া বলি, আমি আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

ফরিয়াদীর উকীল চটিলেন,. তাঁহার মূল্যবান্ সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে।

কমলাকান্ত তাহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি বোধ হইতেছে উকীল ?"

উকীল। (হাসিয়া) কিসে চিনিলে ?

কমলা। বড় সহজে। মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখিয়া। তা মহাশয়! আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি, যখন মোয়াক্কেল আসে।

উকীল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিল, "I ask the protection of the court against the insult of the witness."

কোর্ট বলিলেন, "Oh Baboo, the witness is your own witness, and you are at liberty to send him away if you like."

এখন কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীলবাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না ; সুতরাং উকীলবাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হাকিমটি জাতিভ্রষ্ট—পালের মত নয়।

হাকিম গতিক দেখিয়া মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "ও শপথের প্রতি সাক্ষীর objection আছে। উহাকে Simple affirmation দাও।" তখন মুহুরি কমলাকান্তকে বলিল, "আচ্ছা ও ছেড়ে দাও বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বল।"

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না ?

মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধর্মাবতার, সাক্ষী বড় সেরকস্।"

উকীল বাবু বলিলেন, "Very obstructive."

কমলাকান্ত। (উকিলের প্রতি) শাদা কাগজে দস্তখত করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের বাহিরে চলে জানি—ভিতরেও চলিবে কি ?

উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে?

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি লেখা হয়, তাহা না দেখিয়া দস্তখত করা একই কথা।

হাকিম তখন মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও—গোলমালে কাজ নাই।"

মুহুরি তখন বলিল, "শোন, তোমাকে বলিতে হইবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।"

কমলা। ওঁ মধু মধু মধু!

মুহুরি। সে আবার কি?

কমলা। পড়াম আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ত তখন আর কোন গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকীল বাবু গাত্রোত্থান করিলেন। কমলাকান্তকে চোখ রাঙাইয়া বলিলেন, "এখন আর বদমায়েসি করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।"

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর কিছু বলিতে পাইব না?

উকীল। না।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিল,—অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, কোন কথা গোপন করিব না। ধর্মাবতার, বে-আদবি মাফ হয়। পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল, সে সাধ এখানেই মিটিল। উকীল বাবু অধিকারী—আমি

যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব, যা না বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের অপবাধ লইবেন না।"

হাকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিবে,—তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার।

কমলাকান্ত তাহাকে সেলাম করিয়া বলিল, "বহুত খুব।" উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, "তোমার নাম কি?"

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

উকীল। তোমার বাপের নাম কি?

কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুদয়িক আছে না কি?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, "হুজুর, এ সব Contempt of court।" হুজুর উকীলের দুর্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন—বলিলেন, "আপনারই সাক্ষী।" সুতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন,—"বল, বলিতে হইবে।"

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি জাতি?"

কমলা। আমি কি একটা জাতি?

উকীল। তুমি কোন জাতীয়?

কমলা। হিন্দু-জাতীয়।

উকীল। আঃ! কোন্ বর্ণ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকীল। দূর হোক ছাই। এমন সাক্ষীও আনে? বলি—তোমার জাত আছে?

কমলা। মারে কে?

হাকিম দেখিলেন উকীলের কথায় হইবে না, বলিলেন, "ব্রাহ্মণ,

কায়স্থ, কৈবর্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে, জান ত—তুমি তার কোন্ জাতির ভিতর ?

কমলা। ধর্মাবতার! এ উকীলেরই ধৃষ্টতা! দেখিতেছেন, আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্তী—ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব ?

হাকিম লিখিলেন, "জাতি ব্রাহ্মণ।" তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত ?"

এজলাসে একটি ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, "আমার বয়স একান্ন বৎসর দুই মাস, তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট—"

উকীল। কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায় ?

কমলা। কেন, এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে—কোন কথা গোপন করিব না।

উকীল। তোমার যা ইচ্ছা কর। আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথা ?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

উকীল। বলি, বাড়ী কোথা ?

কমলা। বাড়ী দূরে থাক, আমার একটা কুঠারীও নাই।

উকীল। তবে থাক কোথা ?

কমলা। যেখানে সেখানে।

উকীল। একটা আড্ডা তো আছে ?

কমলা। ছিল, যখন নসীবাবু ছিলেন। এখন আর নাই।

উকীল। এখন আছ কোথা ?

কমলা। কেন, এই আদালতে ?

উকীল। কাল ছিলে কোথা ?

কমলা। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, "আর বকাবকিতে কাজ নাই—আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তারপর?

উকীল। তোমার পেশা কি?

কমলা। আমার আবার পেশা কি?

উকীল। বলি খাও কি করিয়া?

কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকীল। সে ডাল-ভাত জোটে কোথা থেকে?

কমলা। ভগবান্ জোটালেই জোটে, নইলে জোটে না।

উকীল। কি উপার্জ্জন কর?

কমলা। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরি কর?

কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।

উকীল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া আদালতকে বলিলেন, "আমি এ সাক্ষী চাই না। আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারিব না।"

প্রসন্ন বাদিনী, উকিলের কোমর ধরিল; বলিল, এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য কথা বলিবে, তাহা আমি জানি—কখনও মিছা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না—তাই ও অমন করিতেছে। ও বামনের আবার পেশা কি? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ! ও কি বলিবে?"

উকীল তখন হাকিমকে বলিল, "লিখুন পেশা ভিক্ষা।"

এবার কমলাকান্ত রাগিল, "কি? কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ভিক্ষোপ-

জীবী ? আমি মুক্তকণ্ঠে হলপের উপর বলিতেছি, আমি কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই না।"

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না, সে বলিল, "সে কি ঠাকুর! কখনও আফিঙ চেয়ে খাও নাই ?"

কমল। ......আফিঙ কি পয়সা! আমি কখন একটি পয়সাও কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই।

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "কি লিখিব কমলাকান্ত ?"

কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, "লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ।" সকলে হাসিল—হাকিম তাহাই লিখিয়া লইলেন।

তখন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ফরিয়াদীকে চেন ?"

কমল। না।

প্রসন্ন হাঁকিল, "সে কি ঠাকুর! চিরটা কাল আমার দুধ-দই খেলে, আজ বল চিনি না ?"

কমলাকান্ত বলিল, "তোমার দুধ-দই চিনি না, এমন কথা ত বলিতেছি না—তোমার দুধ-দই বিলক্ষণ চিনি; যখনই দেখি, এক পোয়া দুধে তিন পোয়া জল, তখনই চিনিতে পারি যে এ প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ। যখনই দেখতে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দধি ফিকে, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্নময়ীর দধি! দুধ-দই চিনি নে ?"

প্রসন্ন নথ ঘুরাইয়া বলিল, "আমার দুধ-দই চেন, আর আমায় চিনিতে পার না ?"

কমলাকান্ত বলিল, "মেয়েমানুষকে কে কবে চিনতে পেরেছে দিদি ? বিশেষ গোয়ালার মেয়ের কাঁকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে ?

উকীল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিলেন, "বুঝা গেল, তুমি বাদিনীকে চেন—উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে ?"

কমলা। মন্দ নয়—এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয় ? বামনের ছেলের গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

উকীল। এমন সম্বন্ধ কি হয় না ? কে জানে, তুমি ওর পোষ্যপুত্র কি না ?

কমলা। ওর নয়, কিন্তু ওর গাইয়ের বটে।

উকীল। বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর একটা সম্বন্ধ আছে, একেবারে সাফ বলিলেই হইত—এত দুঃখ দাও কেন ? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান ?

কমলা। জানি যে, এ মোকদ্দমায় আপনি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী, আর এ আসামী।

উকীল। তা নয়, গোরুচুরির কি জান ?

কমলা। গোরুচুরি আমার বাপ-দাদাও জানে না ; বিদ্যাটা আমায় শিখাইবেন ?—আমার দুধ-দধির বড় দরকার।

উকীল। আঃ—বলি গোরুচুরি দেখিয়াছ ?

কমলা। এক দিন দেখিয়াছিলাম। নসীবাবুর একটা বকনা,—এক বেটা মুচি—

উকীল। কি যন্ত্রণা ! বলি প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি দেখিয়াছ ?

কমলা। না—চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া গোরুটা চুরি করে। তাহা হইলে আপনার কাজের সুবিধা হইত। আমারও কাজের সুবিধা হইত।

প্রসন্ন দেখিল, উকীলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই—তখন

আপনার হাতে হাল লইবার ইচ্ছায়, উকীলের কানে কানে বলিয়া দিল, "ও বামন সে সব কিছুরই সাক্ষী নয়—ও কেবল গোরু চেনে।"

উকীল মহাশয় তখন কূল পাইলেন। গর্জিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোরু চেন ?"

কমলাকান্ত মধুর হাসিয়া বলিল, "আহা, চিনি বই কি, নইলে কি আপনার সঙ্গে এত মিষ্টালাপ করি ?"

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—বলিলেন, "ও সব রাখ।" প্রসন্ন গোয়ালিনীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ছিল—দেখা যাইতেছিল। ডেপুটী বাবু সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোরুটি চেন ?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "কোন্ গোরুটি ধর্মাবতার ?"

হাকিম বলিলেন, "কোন্ গোরুটি কি ? একটি বই ত সামনে নাই ?"

কমলা। আপনি দেখিতেছেন একটি—আমি দেখিতেছি অনেকগুলি।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখিতে পাইতেছ না—ঐ শামলা ?"

কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকীলের শামলার প্রতি চাহিল। বলিল, "এ শামলাও চুরির না কি ?"

কমলাকান্তের নষ্টামী হাকিম আর সহ্য করিতে পারিলেন না—বলিলেন, "তুমি আদালতের কাজের বড় বিঘ্ন করিতেছ—কন্‌টেম্প্‌ট্ অফ কোর্ট জন্য তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা।"

কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া, যোড়হাত করিয়া বলিল, "বহুত খুব হুজুর। জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি ?"

হাকিম। কেন ?

কমলা। কিরূপে আদায় করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।

হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি?

কমলা। ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই—তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না, জিজ্ঞাসা করিব।

হাকিম। জরিমানা না দিতে পার, কয়েদ যাইবে।

কমলা। কত দিনের জন্য ধর্ম্মাবতার?

হাকিম। জরিমানা অনাদায়ে এক মাস কয়েদ।

কমলা। দুই মাস হয় না?

হাকিম। বেশী মিয়াদের ইচ্ছা কেন?

কমলা। সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে—ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়—জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।

এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে? হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি যদি গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা যাইতে পারে। বল—ঐ গোরু তুমি চেন কি না?

হাকিম তখন একজন কনষ্টেবলকে আদেশ করিলেন যে, গোরুর নিকটে গিয়া প্রসন্নের গাই দেখাইয়া দেয়। কনষ্টেবল তাহাই করিল। বিষণ্ণ উকীল তবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ গোরু তুমি চেন?"

কমলা। শিংওয়ালা—তাই বলুন।

উকীল। তুমি বল কি?

কমলা। আমি বলি, শামলাওয়ালা—তা যাক—আমিও শিংওয়ালা গোরুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে!

উকীল। ও কার গোরু ?

কমলা। আমার।

উকীল। তোমার ?

কমলা। আমারই।

হরি হরি! প্রসন্নের মুখ শুকাইল! উকীল দেখিলেন, মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়। প্রসন্ন তখন তর্জন-গর্জন করিয়া বলিল, "তবে রে বিটলে! গোরু তোমার ?"

কমলাকান্ত বলিল, "আমার না ত কার ? আমি ওর দুধ খেয়েছি—ওর দই খেয়েছি—ওর ঘোল খেয়েছি,—ওর মাখন খেয়েছি—ওর ননী খেয়েছি,—ওর ছানা খেয়েছি, ও গোরু আমার হলো না, তুই পালিস্ বলে কি তোর বাবার গোরু হলো ?"

উকীল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন, ধর্মাবতার, witness hostile! permission দিন, আমি ওকে cross করি।

কমলা। কি ? আমায় ক্রস করিবে ?

উকীল। হাঁ, করিব।

কমলা। নৌকায়, না সাঁকো বেঁধে ?

উকীল। সে আবার কি ?

কমলা। বাবা! কমলাকান্ত সাগর পার হও, এত বড় হনূমান তুমি আজও হও নাই।

উকীল তখন কোর্টকে বলিলেন, "ধর্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তি বাতুল ইহাকে আর ক্রস করিবার প্রয়োজন নাই। বাতুল বলিয়া ইহার জোবানবন্দী পরিত্যক্ত হইবে, ইহাকে বিদায় দেওয়া হউক।"

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচেন, এমন সময় প্রসন্ন হাতযোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল, "যদি হুকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং উহাকে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর বিদায় দিতে হয়, দিবেন।"

হাকিম কৌতূহলী হইয়া অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল, "ঠাকুর! মৌতাতের সময় হয়েছে না?"

কমলা। মৌতাতের আবার সময় কি রে···।"

প্রসন্ন। ···এখন মৌতাত করিবে?

কমলা। দে!

প্রসন্ন। আচ্ছা। আগে আমার কথার উত্তর দাও—তার পর সে হবে।

কমলা। তবে জলদি জলদি বল—জলদি জলদি জবাব দিই।

প্রসন্ন। বলি, গোরু কার ঐ শামলা গাই কার?

কমলা। ···যে দুধ খায়, তার।

প্রসন্ন। ···ও গোরু আমার কি না?

কমলা। ···কখন ওর এক বিন্দু দুধ খেলি নে, কেবল বেচে মরলি, গোরু তোর হলো? ও গোরু যদি তোর হয়, তবে বাঙ্গাল বেঙ্কের টাকাও আমার। ···গরু চোরকে ছেড়ে দে।—গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।

হাকিম দেখিলেন, দুই জনে বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে, আদালত মেছোহাটা হইয়া উঠিল। তখন উভয়কে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—

"প্রসন্ন এই গোরুর দুধ বেচে।

কমলা। আজ্ঞা হাঁ।

"উহার গোয়ালে এই গোরু থাকে?"

কমলা। ও গোরুও থাকে। আমিও কখন কখন থাকি।

"ঐ খাওয়ায়?"

কমলা। উভয়কে।

বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, আমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে—আমি উহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আসামীর উকীল গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার তুমি কে?"

আসামীর উকীল বলিলেন, "আমি আসামীর পক্ষে তোমায় ক্রস করিব।"

কমলা। এক জন ত ক্রস করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে না কি?

উকীল। কুমার বাহাদুর কে?

কমলা। রাজপুত্রকে চেন না? ত্রেতাযুগে আগে ক্রস করিলেন পবনাঙ্গজ মহাশয়! তার পর ক্রস করিলেন কুমার বাহাদুর।*

উকীল। ও সব রাখ—তুমি গোরু চেন বলিতেছ—কিসে চেন?

কমলা। কখন শিঙ্গে—কখন শামলায়।

উকীল রাগিয়া উঠিয়া, গর্জন করিয়া টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, তোমার পাগলামী রাখ—তুমি এই গোরু চিনিতে পারিতেছ কিসে?

কমলা। ঐ হাম্বা-রবে।

উকীল হতাশ হইয়া বলিলেন, "Hopeless!" উকীল মহাশয় বসিলেন—আর জেরা করিবেন না। কমলাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "দড়ি ছেঁড় কেন বাবা?"

উকীল আর জেরা করিবেন না দেখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন। কমলাকান্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইল। আমি কিছু কাজ সারিয়া

---

* অঙ্গদ।

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, কমলাকান্ত খেলো হুঁকো হাতে···চারিদিকে লোক জমিয়াছে। প্রসন্ন সেখানে আসিয়াছে। কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে আর বলিতেছে, "তোর মঙ্গলার বাঁটের দিব্য —তোর দুধের কেঁড়ের দিব্য,—তোর ঘোল মউনির দিব্য, তোর ফাঁদি নথের দিব্য, তুই যদি চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস্।

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম মনুষ্যটা নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

খোসনবীশ জুনিয়র

বিনি পয়সার ভোজ



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপিসের বেশে অক্ষয়বাবু

(হাসিতে হাসিতে) আজ আচ্ছা জব্দ করেছি। বাবু রোজ আমাদের স্কন্ধে বিনামূল্যে বিনামাসুলে ইয়ারকি দিয়ে বেড়ান, আর লম্বাচওড়া কথা কন। মশায়, আজ বছরখানেক ধরে রোজ বলে আজ খাওয়াব, কাল খাওয়াব, খাওয়াবার নাম নেই। যতখানি আশা দিয়েছে তার সিকি পরিমাণ যদি আহার দিত তাহলে এতদিনে তিনটে রাজসূয় যজ্ঞ হ'তে পারত। যা হ'ক আজ তো বহু কষ্টে একটা নিমন্ত্রণ আদায় করা গেছে। কিন্তু দুটি ঘণ্টা বসে আছি এখনো তার দেখা নেই। ফাঁকি দিলে না তো। (নেপথ্যে চাহিয়া) ওরে কী তোর নাম, ভূতো, না মেধো, না হরে।

চন্দ্রকান্ত ? আচ্ছা বাপু তাই সই। তা ভালো চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন আসবে বল দেখি।

কী বললি। বাবু হোটেল থেকে খাবার কিনে আনতে গেছেন ? বলিস কী রে। আজ তবে তো রীতিমত খানা। খিদেটিও দিব্যি জমে এসেছে। মটনচপের হাড়গুলি একেবারে পালিশ করে হাতির দাঁতের চুষিকাঠির মতো চকচকে করে রেখে দেব। একটা মুরগির কারি অবশ্যি থাকবে—কিন্তু কতক্ষণই বা থাকবে। আর দু-রকমের দুটো পুডিং যদি দেয় তাহলে চেঁচেপুঁছে চীনেমাটির বাসনগুলোকে একেবারে কাঁচের আয়না বানিয়ে দেব। যদি মনে করে' ডজন-দুত্তিন অয়স্টার প্যাটি আনে তাহলে ভোজনটি বেশ পরিপাটি রকমের হয়। আজ সকাল থেকে ডান চোখ নাচছে, বোধহয় অয়স্টার প্যাটি আসবে। ওহে ও চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন গেছেন বল দেখি।

অনেকক্ষণ গেছেন ? তবে আর বিস্তর বিলম্ব নেই। ততক্ষণ একছিলিম তামাক দাও না। অনেকক্ষণ ধরে বলছি কিন্তু তোমার গা

দেখছি নে। তামাক বাইরে নেই? বাবু বন্ধ করে রেখে গেছেন? এমন তো কখনো শুনি নি। এ তো কোম্পানির কাগজ নয়। কী করা যায়। আমি একটু-আধটু আফিম খাই, তামাক না হলে আর তো বাঁচি নে। ও হে, মেধো, না না চন্দ্রকান্ত, কোনোমতে মালিদের কাছ থেকে হ'ক যেখান থেকে হ'ক একছিলিম জোগাড় করে দিতে পার না?

বাজার থেকে কিনে আনতে হবে? পয়সা চাই? আচ্ছা বাপু তাই সই। এই নাও, এক পয়সার তামাক চট করে কিনে নিয়ে এস।

এক পয়সায় তামাক হবে না? কেন হবে না। বাপু আমাকে কি মুচিখোলার নবাব বলে হঠাৎ তোমার ভ্রম হয়েছে। যোলো টাকার ভরির অম্বরি তামাক না হ'লেও আমার কষ্টেস্থষ্টে চলে যায়—এক পয়সাতেই ঢের হবে।

হুঁকো কলকেও কিনতে হবে? সে-ও তোমার বাবু লোহার সিন্ধুকে পুরে রেখে গেছেন নাকি? বাঙাল ব্যাঙ্কে সেফ ডিপজিট করে আসেন নি কেন? ও রে বাস রে। এ তো ভাল জায়গায় এসে পড়া গেছে দেখছি। তা নাও, এই ছটি পয়সা ট্রামের জন্য রেখেছিলুম। উদয় ফিরে এলে তার কাছ থেকে সুদসুদ্ধ আদায় করে নিতে হবে। এই বুঝি বাবুর বাগানবাড়ী, তাহলে এঁর ভদ্রাসন—বাড়ি কি রকম হবে না জানি! কড়িগুলো মাথায় ভেঙে না পড়লে বাঁচি। এই তো একখানি ভাঙা চৌকি আসবাবের মধ্যে। এ আমার ভর সইবে না। সেই অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হয়ে গেল—আর তো পারি নে—এই ম্যাটিতেই বসা যাক।

কোঁচা দিয়া ধুলা ঝাড়িয়া একটা খবরের কাগজ মাটিতে পাতিয়া উপবেশন ও গুন গুন স্বরে গান

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনে পয়সার ভোজ।
ডিশের পর ডিশ
(শুধু) মটন কারি ফিশ,
সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা দু-চার রয়েল ডোজ।
পরের তহবিল
চোকায় উইলসনের বিল।
থাকিয়া মনের সুখে হাস্যমুখে কে কার রাখে খোজ।—

কই রে। তামাক এল? ও কী রে। শুধু কলকে? হুঁকো কই। এখানে ছ'পয়সায় হুঁকো পাওয়া যায় না? কলকেটার দাম দু-আনা? হ্যা দেখো বাপু চন্দ্রকান্ত, বাইরে থেকে আমাকে দেখে যতটা বোকা মনে হয় আমি ততটা নই। শরীরটা যত মোটা, বুদ্ধিটা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম। তোমার বাবু যে হুঁকোটা কলকেটা তামাকটা পর্যন্ত আয়রন চেষ্টে তুলে রেখে দেন এতক্ষণে তার কারণ বোঝা গেল। কেবল তোমার মত রত্নটিকে বাইরে রাখাই তাঁর ভুল হয়েছে। বোধহয় বেশিদিন বাইরে থাকতেও হবে না। কোম্পানি বাহাদুর একবার খবরটি পেলেই পাহারা বসিয়ে খুব হেপাজতের সঙ্গেই তোমাকে রাখবেন। যা হ'ক তামাক না খেয়ে তো আর বাঁচিনে। (কলিকায় মুখ দিয়া তামাক টানিয়া কাশিতে কাশিতে) ও রে বাবা, এ কোথাকার তামাক। এ যে উইল করে টানতে হয়। এর দু-টান টানলে স্বয়ং বাবা ভোলানাথের মাথার চাঁদি ফট করে ফেটে যায়, নন্দীভৃঙ্গীর ভিরমি লাগে। কাজ নেই বাপু, থাক্। বাবু আগে আসুন। কিন্তু বাবুর আসবার জন্যে তো কোনোরকম

তাড়া দেখছি নে। সে বোধহয় প্যাটিগুলো একটি একটি করে শেষ করছে। এদিকে আমার পেট এমনি জ্বলে উঠেছে যে, মনে হচ্ছে যেন এখনি কোঁচায় আগুন ধরে যাবে। তৃষ্ণাও পেয়েছে। কিন্তু জল চাইলেই আমাদের চন্দ্রকান্ত বলে বসবেন গেলাস কিনে আনতে হবে, বাবু বন্ধ করে রেখে গেছেন। কাজ নেই। বাগানের ডাব খাওয়া যাক।

ও হে বাপু চন্দ্র একটা কাজ করতে পার? বাগান থেকে চট করে একটা ডাব পেরে আনতে পার? বড়ো তেষ্টা পেয়েছে।

কেন। ডাব পাওয়া যাবে না কেন। বাগানে তো ডাব বিস্তর দেখে এলুম।

সব গাছ জমা দেওয়া হয়েছে? তা হ'ক না বাপু একটা ডাবও মিলবে না?

পয়সা চাই? পয়সা তো আর নেই। তবে থাক, বাবু আসুন, তারপরে দেখা যাবে। সঙ্গে মাইনের টাকা আছে কিন্তু ওকে ভাঙাতে দিতে সাহস হয় না। এখনো কোম্পানির মুল্লুকে যে এতবড়ো একটা ডাকাত বাইরে ছাড়া আছে তা আমি জানতুম না। যাই হ'ক এখন উদয় এলে যে বাঁচি।

ওই বুঝি আসছে। পায়ের শব্দ শুনছি। আঃ বাচা গেল। ও হে উদয়, ও হে উদয়। কই, না তো। তুমি কে হে।

বাবু তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন। তার চেয়ে নিজে এলেই তো ভাল করতেন। খিদেয় যে মারা গেলুম।

হোটেলের বাবু? কেরানি বাবু? কই তাঁর সঙ্গে আমার তো কোনো আত্মীয়তা নেই। কিছু খাবার পাঠিয়েছেন বলতে পার? অয়স্টার প্যাটি পাঠান নি? বিল পাঠিয়েছেন? কৃতার্থ করেছেন আর কি। যে বাবুটির নামে বিল তিনি এখানে উপস্থিত নেই।

আরে না রে না। আমি না। এও তো ভাল বিপদে পড়লুম।

আরে মাইরি না। কী গেরো। তোমাকে ঠকিয়ে আমার লাভ কি বাপু। আমি নিমন্ত্রণ খেতে এসে তিনঘণ্টা এখানে বসে আছি—তুমি হোটেল থেকে আসছ, তবু তোমাকে দেখেও অনেকটা তৃপ্তি হচ্ছে। বোধহয় তোমার ঐ চাঁদরখানা সিদ্ধ করলে ওর থেকে নিদেন—ভয় নেই, আমি তোমার চাদর নেব না, কিন্তু বিলটিও চাই নে।

এ তো ভাল মুস্কিল দেখছি। ও গো না গো না। আমি উদয়বাবু নই, আমি অক্ষয়বাবু। কী গেরো। আমার নাম আমি জানি নে তুমি জান। অত গোলে কাজ কী বাপু, তুমি গিয়ে একটু বসো, উদয়বাবু এখুনি আসবেন।

বিধাতা সকালবেলায় এই জন্যেই কি ডান চোখ নাচিয়েছিলে। হোটেল থেকে ডিনার না এসে বিল এসে উপস্থিত?

"সখি, কি মোর করম ভেল।

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল।"

হে বিধি, তোমারই বিচারে সমুদ্রমন্থনে একজন পেলে সুধা আর একজন পেলে বিষ, হোটেল মন্থনেও কি একজন পাবে মজা আর একজন পাবে তার বিল। বিলটাও তো কমদিনের নয় দেখছি।

তুমি আবার কে হে। বাবু পাঠিয়ে দিলে? বাবুর যথেষ্ট অনুগ্রহ। কিন্তু তিনি কি মনে করেছেন তোমার মুখখানি দেখেই আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হবে। তোমার বাবু তো বড়ো ভদ্রলোক দেখছি হে।

কী বললে কাপড়ের দাম? কার কাপড়ের দাম। উদয়বাবু কাপড় কিনবেন আর অক্ষয়বাবু তার দাম দেবে? তোমার তো বিবেচনাশক্তি বেশ দেখছি।

সত্যি নাকি। কিসে ঠাওরালে আমারই নাম উদয়বাবু। কপালে কি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রেখেছি। আমার অক্ষয়বাবু নামটা কি তোমার পছন্দ হল না।

নাম বদলেছি ? আচ্ছা বাপু শরীরটা বদলানো তো সহজ ব্যাপার নয়। উদয়বাবুর সঙ্গে কোনখানটা মেলে বলো দেখি।

উদয়বাবুকে কখনো চাক্ষুষ দেখনি? আচ্ছা একটু সবুর করো, তোমার মনের আক্ষেপ মিটিয়ে দেব। বিস্তর দেরি হবে না,*তিনি এলেন বলে।

আরে ম'ল। আবার কে আসে। মশায়ের কোত্থেকে আসা হল। মশায়েরও এখানে নিমন্ত্রণ আছে বুঝি ?

বাড়িভাড়া ? কোন বাড়ির ভাড়া মশায়। এই বাড়ির ? ভাড়াটা কত হিসেবে।

মাসে সতেরো টাকা ! তাহলে হিসেব করুন দেখি সাড়ে তিন ঘণ্টায় কত ভাড়া হয়।

ঠাট্টা করছিনে মশায়—মনের সে-রকম প্রফুল্ল অবস্থা নয়। এ-বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে আমি সাড়ে তিন ঘণ্টা কাল আছি। সে জন্যেও যদি ভাড়া দিতে হয় তো ন্যায্য হিসেব করে নিন। তামাকটা পর্যন্ত পয়সা দিয়ে খেয়েছি।

আজ্ঞে না, আপনি ঠিকটি অনুমান করতে পারেন নি—আপনার ঈষৎ ভুল হয়েছে—আমার নাম উদয় নয়, অক্ষয়। এ-রকম সামান্য ভুলে অন্য সময় বড়ো একটা কিছু আসে যায় না কিন্তু বাড়িভাড়া আদায়ের সময় বাপ-মায়ে যার যে নাম দিয়েছেন সেইটে বাঁচিয়ে কাজ করলেই সুবিধে হয়।

আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলছেন ? মাপ করবেন, ওইটি পারব না। সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে পেটের জ্বালায় মরছি, ঠিক যেই খাবারটি আসবার সময় হল অমনি আপনি গাল দিচ্ছেন বলেই যে বাড়ি চলে যাব আমাকে তেমন গর্দভ ঠাওরাবেন না। আপনি ওইখানেই বসুন, যা যা বলবার অভিপ্রায় আছে বলে যান, আমি আহারান্তে বাড়ি ছেড়ে যাব।

বকে বকে আমার গলা শুকিয়ে এল, আর তো বাঁচি নে। খিদেয় নাড়িগুলি বেবাক হজম হয়ে গেল। ওই যে পায়ের শব্দ। ও হে উদয় আমার অন্ধের নড়ি, আমার সাগরসেঁচা সাত রাজার ধন মাণিক, একবার উদয় হও হে। আর তো প্রাণ বাঁচে না।

তুমি আবার কে হে। যদি গালমন্দ দেবার থাকে তো ওইখানে বসেই আরম্ভ করে দাও। দোহারকি করবার অনেকগুলি লোক উপস্থিত আছেন।

হরিবাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন? শুনে বড়ো সন্তোষ লাভ করলুম। তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন সন্দেহ নেই কিন্তু আমার পরম বন্ধু যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন, তাঁদের কোনো দেখা সাক্ষাৎ নেই আর যাঁদের সঙ্গে আমার কোন কালে কোনো পরিচয় নেই, তারা যে আজ প্রাতঃকাল থেকে আমাকে এত ঘন ঘন খাতির করছেন এর কারণ কী। আচ্ছা মশায়, হরিবাবু নামক কোনো একটি ভদ্রলোক আমাকে কেন এমন অসময়ে স্মরণ করলেন এবং হঠাৎ এতই অধৈর্য হয়ে উঠলেন বলতে পারেন কি।

কী! আমি আমার স্ত্রীর বালা গড়াবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে নমুনাস্বরূপ গহনা এনে ফিরিয়ে দিচ্ছিনে? দেখো, এ সম্বন্ধে আমার অনেকগুলি কথা বলবার ছিল কিন্তু আপাতত একটি বললেই যথেষ্ট হবে—আমি কারো কাছ থেকে কোনো গহনা আনি নি এবং আমার স্ত্রী নেই। প্রধান প্রধান কথা আর যা বলবার ছিল সে আজকের মতো মাপ করবেন—গলা শুকিয়ে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মরছি। আপনি আর আধঘণ্টা কাল অপেক্ষা করুন, সমস্ত সমাচার অবগত হবেন। (উচ্চৈস্বরে) ওরে উদয়, ওরে উদো, ওরে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা পাজি ছুঁচো ড্যাম শুয়ার ইষ্টুপিড ওরে পেট যে জ্বলে গেল, গলা যে শুকিয়ে যায়, মাথা যে ফেটে যাচ্ছে—ওরে নরাধম, কুলাঙ্গার।

আরে না মশায়—আপনাদের সম্ভাষণ করছিনে। আপনারা চঞ্চল হবেন না। আমি পেটের জ্বালায় মনের খেদে প্রাণের বন্ধুকে ডাকছি। আপনারা বসুন।

আর বসতে পারছেন না? অনেক দেরি হয়ে গেছে? সে-কথা আর আমাকে বলতে হবে না। দেরি হয়েছে সন্দেহ নেই। তাহ'লে আপনাদের আর পীড়াপীড়ি করে ধরে রাখতে চাইনে। তবে আজকের মতো আপনারা আসুন। আপনাদের সঙ্গে মিষ্টালাপে এতক্ষণ বেশ সুখে কেটেছিল।

কিন্তু এখন যে কথাগুলো বলছেন ওগুলো কিছু অধিক পরিমানেই বলছেন। খুব পরম বন্ধুকেও মানুষ ভালবেসে শ্যালক সম্ভাষণ করতে হঠাৎ কুণ্ঠিত হয়, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে অল্পক্ষণের আলাপেই যে আপনারা এতটা ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা করছেন সেজন্যে আমি মনে মনে কিছু লজ্জা বোধ করছি। জানবেন আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক কোনোরকম অসদ্ভাব নেই কিন্তু আপনারা আমার কাছে যতটা প্রত্যাশা করছেন আমি ততটা দিতে একেবারে অক্ষম।

মশায়রা আর বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনারা বোধহয় দু-বেলা নিয়মিত আহার করে থাকেন, খিদে পেলে মানুষের মেজাজটা কী রকম হয় ঠিক জানেন না, তাই আমাকে এমন অবস্থায় ঘাঁটাতে সাহস করছেন।

আবার ফের। দেখো বাপু আমার সঙ্গে পারবে না। শরীরটা দেখেই বুঝতে পারছ না! বহু কষ্টে রাগ চেপে আছি, পাছে একটা খুনোখুনি কাণ্ড করে বসি। আচ্ছা, আমাকে রাগাও দেখি। দেখি তোমাদের কত ক্ষমতা। কিছুতেই রাগাতে পারবে না। এই দেখো আমি খুব গম্ভীর হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসলুম। ও বাবা। এরা যে সবাই মিলে মারধোর করবার জোগাড় করে। খালি পেটে খিদের উপর

মারটা সয় না দেখছি। আচ্ছা বাপু তোমরা সবাই বসো। তোমাদের কার কতো পাওনা আছে বলো। ভাগ্যি মাইনের টাকাটা পকেটে ছিল, নইলে আজ নিতান্তই ধনঞ্জয়কে স্মরণ করে একপেট খিদে সুদ্ধ দৌড় মারতে হত। 'আপাতত প্রাণটা বাঁচাই তারপর টাকাটা উদয়ের কাছ থেকে আদায় করে নিলেই হবে।

তোমার পাঁচ টাকা বই পাওনা নয় কিন্তু তুমি পঞ্চান্ন টাকার গাল পেড়ে নিয়েছ বাপু—এই নাও তোমার টাকা।

ওহে বাপু, তোমার হোটেলের বিল এই শুধে দিচ্ছি, যদি কখনো অসময়ে তোমার শরণাগত হতে হয় তাহলে স্মরণ রেগো।

তোমার তিন মাসের বাড়ি ভাড়া পাওনা? এক মাসের টাকাটা আজ দিচ্ছি বাকি পরে নিয়ো। তুমি তো ভাই তোমার গালমন্দ আমাকে ষোল আনাই চুকিয়ে দিয়েছ, তাতে বোধ করি তোমার মনটা কতকটা খোলসা হয়েছে, এগন আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যাও।

ওহে বাপু, তোমার গহনা ফিরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। যদি আমার স্ত্রী থাকতেন আর তোমার গহনা তাঁকে দিতুম তাহলেও ফিরিয়ে আনা শক্ত হত; আর যখন তিনি বর্তমান নেই এবং তোমার গহনা তাঁকে দিই নি তখন ফিরিয়ে আনা আরও কত কঠিন তা একটুখানি ভেবে দেখলে তুমিও হয়তো বুঝতে পারবে। তবু যদি পীড়াপাড়ি কর তাহলে কাজেই তোমার হরিবাবুর ওখানে আমাকে যেতে হবে, কিন্তু খাবারটা আসে কি না আর একটু না দেখে যেতে পারছি নে। উঃ! আর তো পারি নে। চন্দ্র, ওহে চন্দ্র। এখানে উদয়ের তো কোনো সম্পর্ক নেই, এখন তুমি সুদ্ধ অস্ত গেলে আমি যে অন্ধকার দেখি। চন্দ্র। ওহে চন্দ্রকান্ত। এই যে এসেছ। চন্দ্র, তুমি তো তোমার বাবুকে চেন, সত্য করে বলো দেখি আজ কাল এবং পরশুর মধ্যে তিনি কি হোটেল থেকে ফিরবেন।

বোধ হয় ফিরবেন না ? এতক্ষণ পরে তোমার এই কথাটি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্ছে। যা হ'ক বড্ড খিদে পেয়েছে, এখন আর গাল দেবার সময় নেই, এই আধুলিটি নিয়ে যদি চট করে কিছু খাবার কিনে আন, তাহলে প্রাণ রক্ষা হয়।

লোকটা নবাবি করে বেড়ায় অথচ কাজকর্ম কিছু নেই, আমরা ভাবতুম চালায় কী করে। এখন ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। কিন্তু প্রত্যহ এতগুলি গাল হজম করে, এতগুলি বিল ঠেকিয়ে, এতগুলি লোক খেদিয়ে রাখা তো কম কাণ্ড নয়। এতে মজুরি পোষায় না, এর চেয়ে ঘানি ঠেলেও সুখ আছে।

কী হে। শুধু মুড়ি নিয়ে এলে ? আর কিছু পাওয়া গেল না ? পয়সা কিছু ফিরেছে ? না ? আচ্ছা তবে দাও মুড়িই দাও।

আহার

ওহে চন্দ্র, কী বলব, ক্ষুধার চোটে এই বাসি মুড়ি যেন সুধা বলে বোধ হচ্ছে। অনেক নিমন্ত্রণ খেয়েছি কিন্তু এমন সুখ পাই নি। চন্দ্র। তুমি সুধাকর বটে কিন্তু আজকে কলঙ্কের ভাগটাই কিছু বেশি দেখা গেল। ডাবও একটা এনেছ দেখছি, এর জন্যেও স্বতন্ত্র কিছু দিতে হবে নাকি ?

হবে না ? শরীরে দয়ামায়া কিছু আছে বোধ হচ্ছে, এখন যদি একটি গাড়ি ডেকে দাও তো আস্তে আস্তে বিদায় হই।

গাড়ি এখানে পাওয়া যায় না ? তবে তো বড় বিপদে ফেললে। আমি এখন না খেয়ে কাহিল শরীরে দেড় ক্রোশ রাস্তা হাঁটতে পারব না, যখন সম্মুখে আহারের আশা ছিল তখন পেরেছিলুম। কী করব। বেরিয়ে পড়া যাক।

কী সর্বনাশ। এই সময়ে আবার হরিবাবুর ওখানে যেতে হবে ?

চন্দ্র, তুমি আজ আমার বিস্তর উপকার করেছ এখন আর কিছু করতে হবে না, এই ভদ্রলোকের ছেলেটিকে বুঝিয়ে দাও আমি উদয়বাবু নই, আমি আহিরিটোলার অক্ষয়বাবু।

ও তোমার কথা বিশ্বাস করবে না? সেজন্য ওকে আমি বেশি দোষ দিতে পারি নে, বোধ হয় তোমাকে অনেক দিন থেকে চেনে। যা হক আর ঝগড়া করবার সামর্থ্য নেই, আস্তে আস্তে হরিবাবুর ওখানেই যাওয়া যাক। বাপু, যে রকম অবস্থা দেখছ পথে যদি একটা কিছু ঘটে দাহ করবার ব্যয়টা তোমার স্কন্ধে পড়বে—আগে থাকতে বলে রাখলুম।

চন্দ্র, তুমি আবার হাত বাড়াও কেন হে। তোমাদের কল্যাণে যে-রকম সস্তায় আজ নেমন্তন্ন খেয়ে গেলুম বহুকাল আমার আর খিদে থাকবে না। আরো কী চাও।

ও! বকশিশ! সেটা চুকিয়ে দেওয়াই ভালো। যখন এতই করলেম তখন সর্বশেষে ওই খুঁতটুকু আর রাখব না। কিন্তু আমার কাছে আর একটি মাত্র টাকা বাকি আছে। তার মধ্যে বার আনা আমি গাড়িভাড়ার জন্যে রেখে দিতে চাই। তোমার কাছে খুচরো যদি কিছু থাকে তাহলে ভাঙিয়ে—

খুচরো নেই? (পকেট উলটাইয়া শেষ টাকাটি দিয়া) তবে এই নাও বাপু। তোমাদের বাড়ি থেকে বেরোলুম একেবারে "গজভুক্ত কপিত্থবৎ।"

কিন্তু এই যে টাকাগুলি দিলুম, উদয়ের কাছ থেকে ফিরে আদায় করবার কী উপায় করা যায়। একটা দামি জিনিস যদি কিছু পাওয়া যায় তো আটক করে রাখি। দামি জিনিসের মধ্যে তো দেখছি ওই চন্দ্রকান্ত। কিন্তু যে-রকম দেখলুম ওঁকে সংগ্রহ করা আমার কর্ম নয়, আমাকে উনি ট্যাঁকে গুঁজে নিতে পারেন।

(কোণে একটা দেরাজ সবলে খুলিয়া) বাঃ, এই তো ঠিক হয়েছে। চেনটিও দিব্যি। তাহলে ঘড়িসুদ্ধ এইটি দখল করা যাক।

কী হে চন্দ্র, এত ব্যস্ত কেন?

পুলিস? পুলিস আসছে?

আমাকে পালাতে হবে? কেন, কী দুষ্কর্ম করেছি। কেবল এক ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি, তার যা শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে।

তাই তো সত্যিই দেখছি! চন্দ্র কোথায় গেল। হরিবাবুর সেই লোকটিকেও যে দেখছি নে। সবাই পালিয়েছে।

দেখো বাপু গায়ে হাত দিও না। ভালো হবে না। আমি ভদ্রলোক। চোর নই জালিয়াত নই।

উঃ কর কী। লাগে যে। বাবা আজ সমস্ত দিন কেবল মুড়ি খেয়ে পথ চেয়ে আছি, আজ তোমাদের এ-সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগছে না।

পেয়াদা বাবা, বরঞ্চ কিছু জলপানি নাও। (পকেটে হাত দিয়া) হায় হায় একটি পয়সা নেই। দারোগা সাহেব, যদি চোর ধরতে চাও, চলো আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। জেল সৃষ্টি হয়ে পর্যন্ত এত বড়ো চোর পৃথিবীতে দেখা দেয় নি।

কী করেছি বলো দেখি। জীবনবাবুর নাম সই করে হ্যামিলটনের দোকান থেকে ঘড়ি এনেছি? পেয়াদাসাহেব, ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রলোকের নামে ফস করে এত বড়ো অপবাদটা দিলে?

ও কী ও। ওটা ধরে টেনো না। ও আমার ঘড়ি নয় শেষকালে যদি চেনমেন ছিঁড়ে যায় তাহলে আবার মুশকিলে পড়তে হবে।

কী। এই সেই হ্যামিলটনের ঘড়ি? ও বাবা সত্যি নাকি। তা নিয়ে যাও এখনি নিয়ে যাও। কিন্তু ঘড়ির সঙ্গে আমাকে সুদ্ধ টান

কেন। আমি তো সোনার চেন নই। আমি সোনার অক্ষয় বটে, কিন্তু সে-ও কেবল বাপ-মায়ের কাছে।

তা নিতান্তই যদি না ছাড়তে পার তো চলো। বাবা, আমাকে সবাই ভালোবাসে, আজ তার বিস্তর পরিচয় পেয়েছি, এখন তোমার ম্যাজিস্ট্রেটের ভালোবাসা কোনো মতে এড়াতে পারলে এ-যাত্রা রক্ষা পাই।

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সায় ভোজ।



ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

নাম কে ন।

গুড়, উড়ের দো৷ কানে

রস, রায় বামণীর কাছে এ

জিনিস মাগিয়া বেড়াইলে বাবুর

আমাদের পর্যন্ত ঘাড় হেঁট হয়।

কাছে আমরা মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারি না।

বিদ্যাধরী ফোঁস করিয়া বলিল,—"তোমরা সকল তাতেং ছল ধর। মা আমাকে একটু ভালবাসেন, তাই সকলে তোমরা ফাটিং মর। আমার অরুচি, মুখে কিছু ভাল লাগে না। চড়াই পাখী আহার। না খাইয়া যেন দড়ি হইয়া যাইতেছি। গতর না থাকিলে পরের বাড়ী কাজ করিব কি করিয়া? তাই তেঁতুল দিয়া, গুড় দিয়া, যা দিয়া পারি এক মুঠা ভাত খাইতে চেষ্টা করি। আমি গরীব মানুষ। পয়সা কোথা পাইব যে, সন্দেশ রসগোল্লা কিনিব? মুদী আমাকে ভালবাসে, তাই সেদিন সে আমাকে একটু গুড় দিয়াছিল। ময়রা আমাকে ভালবাসে, তাই সেদিন আমাকে শালপাতের ঠোঙ্গা করিয়া রসগোল্লার খানিক রস দিয়াছিল। তাতে তোমরা হিংসায় ফাটিয়া মর কেন বল দেখি?"

পিতেম বলিল,—"তোমার অরুচি। পাথরটি টই-টুম্বর করিয়া বামন ঠাকুর তোমাকে ভাত দেয়, তারপর দুইবার তিনবার তুমি ভাত চাহিয়া লও। এই ত তোমার অরুচি; এর উপর যদি রুচি থাকিত, তাহা হইলে ঘোড়াশালের ঘোড়া, হাতীশালের হাতী খাইতে। অনেক বাবুর বাড়ী চাকুরী করিয়াছি, অনেক ঝি দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত মাগস্তড়ে বেহায়া ঝি কখনও দেখি নাই। বামন

ঠাকুর! তুমি বল দেখি, এ ··· তিনজনের খোরাক একেলা খায় কি না।"

ছিদেম বলিল,—"দেখ বিদ্যাধরি! লোকের কাছে গিয়া যা তা মাগা ভাল নয়, তাতে মনিবের অপমান হয়। আমি রসুই করি, নিজে আমি তোমাকে ভাত দিই। সকলের চেয়ে তোমাকে আমি বেশী তরকারী দিই। তোমার বাছা, আবার অরুচি কোথায়?"

গোলাপী বলিল,—"নোলা যদি সামলাইতে না পার সন্দেশ রসগোল্লা যদি খাইতে সাধ হয়, তাহা হইলে পয়সা দিয়া কিনিয়া খাও না কেন? তুমি গরীব, তোমার পয়সা নাই? তোমার গলায় অমন মোটা সোনার দানা, হাতে অমন মোটা তাগা! আর কতবার তুমি আমাকে বলিয়াছ যে, তোমার খোলার ঘরে তক্তোপোষের খুরোর নীচে তুমি ছয় শ টাকা হাঁড়ি করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়াছ। সর্বশুদ্ধ তোমার সেই যার নাম— হাজার টাকা আছে। বিধবা হইয়া পর্যন্ত আমি চাকরাণীগিরি করিতেছি। আমার হাজারটা কড়া ··· নাই। এই পিতেম ছেলেবেলা হইতে খানসামাগিরি করিতেছে। কত টাকা সে করিয়াছে?"

বিদ্যাধরী বলিল,—"আমার পৃথিবীতে কে আছে? একদিন এক মুঠা ভাত দেয় এমন আর কেহ নাই। কাজেই মাহিনাটি যাহা পাই, সেটি আমাকে রাখিতে হয়; ধার-ধোর দিয়া সেটিকে আমাকে বাড়াইতে হয়। তোমার ভাবনা কি বাছা! তোমার ভাই আছে, ভাই-পো আছে। অসময়ে তারা তোমার খোঁজ-খবর লইবে।"

ছিদেম বলিল,—"সকলের কাছে তুমি বল যে, তুমি না খাইয়া খাইয়া রোগা হইয়া যাইতেছ। কিন্তু রোজ রোজ তুমি মোটা হইতেছ। তোমার গায়ে মাছি বসিলে মাছি পিছলাইয়া পড়ে। ··· গিন্নী মায়ের মাগিশো ঝি, তাই জন্ত এত অহঙ্কার! গিন্নী-মা বলেন যে আমার

মাথা ঘোরে, আমার বুক ধড়ফড় করে, আমার তিন শ ষাটখানা ব্যায়রাম। বিদ্যাধরী সেই কথায় বাতাস দেয়। তাই গিন্নী-মা ইহাকে এত ভালবাসেন। কিন্তু সকল কথা যদি বলিয়া দিই, তাহা হইলে দুই দিন এখানে থাকিতে পারে না। হাঁ রে ···! সে দিন গিন্নী-মায়ের জন্য চা করিবার সময় এক থাবা চিনি কে মুখে দিয়াছিল? কড়ার এক পাশে সরের উপর একটু ছেঁদা করিয়া দুধ খাইবার জন্য সকলে আমরা এক একটি নল করিয়াছি। সেই নল দিয়া সকলেই আমরা এক আধ ঢোঁক দুধ খাই-ই। কিন্তু সে দিন সমুদয় কড়া হইতে দুধের সরটুকু কে তুলিয়া খাইয়াছিল? সেদিন মাছ কুটিতে কুটিতে কে কই মাছের পেট হইতে ডিমটুকু বাহির করিয়া লইয়াছিল?"

গোলাপী বলিল,—"পূর্বে চাউল, দাল, তেল যাহা কিছু আমরা বাঁচাইতাম, সকলে ভাগ করিয়া লইতাম। এখন তুমি সেগুলি সব নিজে লও! এ কি ভাল? আমরা কি চাকুরী করিতে আসি নাই। সেদিন মোচার ঘন্টের জন্য উপর হইতে ভিজে ছোলা আর নারিকেল-কোরা আসিয়াছিল। তাহার অর্দ্ধেকগুলি তুমি নিজে খাইলে। তারপর একদিন সকালবেলা গিন্নীর জন্য টাটকা গরম গরম জিলেপি আসিয়াছিল। তার পাশ হইতে পাপড়ি ভাঙ্গিয়া তুমি এতগুলি জমা করিলে। সবগুলি তুমি নিজে খাইলে। কোন্ বলিলে যে, গোলাপী! তুইও দুই একটা পাপড়ি খা। কেন বাছা, আমাদের কি মুখ নাই? না—ভাল-মন্দ জিনিস খাইতে আমাদের সাধ হয় না?"

নীলাম্বর ঘোষের রান্নাঘরে চারিজনে এইরূপ তুমুল বাক্‌যুদ্ধ বাধিয়া গেল। একদিকে ছিদেম ব্রাহ্মণ, পিতেম চাকর ও গোলাপী ঝি। একদিকে তিনজন, অন্যদিকে বিদ্যাধরী ঝি একা! সপ্তরথিবেষ্টিত অভিমন্যু কতক্ষণ বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে? বিদ্যাধরীকে শীঘ্রই পরাভব মানিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইল।

কাঁদিতে কাঁদিতে গিন্নী-মায়ের নিকট গিয়া বিদ্যাধরী বলিল,—"মা! বামুন ঠাকুর বলে যে, তোমার কোন ব্যায়রাম নাই,—সব ঠাট। তোমার মাথা ঘোরে না, তোমার বুক ধড়ফড় করে না! সোহাগ করিয়া তুমি বাবুর টাকার শ্রাদ্ধ করিতেছ। তোমার অরুচি নাই, তোমার গায়ে মাছি বসিলে, মাছি পিছলাইয়া পড়ে।"

গিন্নী বলিলেন,—"বটে বামুনের তো আস্পর্দ্ধা কম নয়, ছোট মুখে বড় কথা।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"আমিও মা, সেই কথা বলি। আমি বলিলাম, দেখ বামুন ঠাকুর মনিবকে অমন কথা বলিতে নাই, যাকে আমি অষ্টপ্রহর দেখিতেছি। তার যে কত অসুখ, সে কথা আর বলিব'কি! কেবল আমার সেবার জোরে তিনি বাঁচিয়া আছেন। এই কথা মা,—আমি যেই বলিয়াছি, আর পোড়ার-মুখো বামন আমাকে কেবল ধরিয়া মারে নাই। কত গালি দিল, কত কুকথা সে যে আমাকে বলিল,—সে কথা মা, তোমাকে আমি আর কি বলিব! সে একা নয়। বাবুর সখের চাকর, পোড়ারমুখো পিতেম, আর আঁটকুড়ী গোলাপীও তার সঙ্গে যোগ দিল! তুমি আমার মা, একটু ভালবাসো, সেই জন্য সকলের হিংসা। তা আমি মা, আর তোমার কাছে থাকতে চাই না। তুমি মা অন্য ঝি দেখিয়া লও।"

পরদিন নীলাম্বরবাবু ছিদেম ব্রাহ্মণকে ডিস্‌মিস্ করিলেন ও পিতেম এবং গোলাপীকে অনেক তিরস্কার করিলেন।

বিদ্যাধরী মনোনীত করিয়া আর একজন ব্রাহ্মণকে লইয়া আসিল। এ ব্রাহ্মণের যেমন মুখশ্রী, লক্ষ লোকের মধ্যেও সেরূপ একটা মুখশ্রী হয় না। মুখমণ্ডলটি প্রকাণ্ড, কিন্তু যতটা দীর্ঘে, প্রস্থে ততটা নহে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু বসন্তের দাগে সমুদয় মুখখানি নানা আকারের গর্তে এত পূর্ণ হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণের প্রকৃত বর্ণ কি, তাহা

সহজে বুঝিতে পারা যায় না। গণ্ডদেশের উপর হাড় দুইটি এত উচ্চ হইয়া আছে যে দুই পার্শ্বে চক্ষু দুইটি যেন দুইটি কূপের মত বোধ হয়। দুই চক্ষুর মাঝখানে নাসিকা অতি দীর্ঘ ও উচ্চ। মুখের হা পুষ্করিণীর ন্যায় প্রশস্ত। সে মুখের হাসি দেখিলে মানুষের আত্মা-প্রাণ শুকাইয়া যায়। চক্ষু ও চুলের বর্ণ তাম্রের ন্যায়; হাজার তেল মাখিলেও চুলের রুক্ষতা যায় না। ব্রাহ্মণের নাম পুরুষোত্তম, বাস উৎকল দেশে।

ঝগড়ার পর বিদ্যাধরী, কিছুদিন ধরিয়া মুদী ও ময়রা কাহার নিকট আর কিছু চায় নাই।

দুইদিন পরে সে পুরুষোত্তমকে বলিল,—"বামুন ঠাকুর! আমাকে তুমি যেমন তেমন ঝি মনে করিও না। এই দেখ, গলায় আমার কেমন সোনার দানা; এই দেখ, হাতে আমার মোটা তাগা। আর আমার ঘরে হাঁড়ি করিয়া ছয়শ টাকা আমি পুতিয়া রাখিয়াছি। কোন কুলে আমার কেহ নাই। আমি অধিকদিন বাঁচিব না। আমার বড় অরুচি। বৈকালবেলা রোজ চক্ষু জ্বালা করিয়া জ্বর হয়। বাঁচিতে আমার সাধ নাই। মরণ হইলেই বাঁচি! কিন্তু পোড়া যম আমাকে ভুলিয়া আছে। আত্মহত্যা করিলে অগতি হইবে, তা না হইলে আমি কোন কালে আফিম খাইয়া, কি গলায় দড়ি দিয়া, কি জলে ডুবিয়া মরিতাম। যাহা হউক, অধিকদিন আমি আর বাঁচিব না! আমার গহনা ও টাকাগুলি আমার মরণের পর তোমার মত কোন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে পায়, তাহাই আমার ইচ্ছা।"

পুরুষোত্তমের মুখ প্রফুল্ল হইল। সে বলিল—"না, না;—তুমি এখন অনেকদিন বাঁচিবে। তোমার ব্যায়রাম তত কঠিন নয়। টাকা পাই না পাই,—মায়ের মত আমি তোমার সেবা করিব। সময় অসময়ে আমি তোমাকে দেখিব।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"সে আর অধিকদিন দেখিতে হইবে না। নিজের শরীর আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তা ছাড়া বাঁচিতে আর আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। টাকাগুলি তোমাকে আমি দিয়া যাব। বাবু উকীল; উইল কাহাকে বলে, তা আমি জানি। গিন্নীর নামে বাবু উইল করিয়াছেন। একখানা কাগজে লিখিলেই হইবে যে, অমুককে আমি আমার টাকা গহনা দিয়া যাইলাম। তা করিলেই তুমি সব পাইবে। কিন্তু একথা প্রকাশ করিও না।"

সেইদিন হইতেই পুরুষোত্তম যত মাছ, যত তরকারী বিদ্যাধরীর পাতে চাপাইতে লাগিল। পিতেম ও গোলাপী কিছু পায় না। সে জন্ত তাহারা ক্রমাগত গজ গজ করিতে লাগিল, কিন্তু বাবুর তিরস্কারের ভয়ে প্রকাশ্য ঝগড়া করিতে পারিল না।

চার পাঁচ দিন পরে বিদ্যাধরী একখানা কাগজ আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিল। পুরুষোত্তম সেই কাগজ কোন লোককে দিয়া পড়াইয়া দেখিল। বিদ্যাধরীর মৃত্যুর পর সমুদয় সম্পত্তি সে পাইবে, কাগজে এইরূপ লেখা ছিল। পুরুষোত্তম আরও জানিয়া দেখিল যে, এরূপ কাগজকে উইল বলে, এইরূপ উইল করিয়া লোক আপনার সম্পত্তি অন্ত লোককে প্রদান করে।

পুরুষোত্তমের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সেই দিন হইতে গোয়ালিনীকে বলিয়া বিদ্যাধরীর জন্ত সে এক পোয়া করিয়া দুধের রোজ করিয়া দিল। সেই দিন হইতে সে নিজের পয়সা দিয়া মেঠাই মোণ্ডা প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিষ বিদ্যাধরীকে খাওয়াইতে লাগিল। একদিন বিদ্যাধরী বলিল,—"আমার আর বিলম্ব নাই। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে,—বিদ্যাধরী! দিন দিন তুই যেন পাখী হইয়া যাইতেছিস্। মুখে যেন তোর কালি মাড়িয়া দিয়াছে, বড় জোর আর তিন মাস। আমি বলিলাম,—কবিরাজ মহাশয়! বাঁচিতে আমার

আর ইচ্ছা নাই। রোগের যন্ত্রনা আর আমার সহ্য হয় না। নিজ হাতে বিষ খাইয়া মরিলে অগতি হইবে। ঔষধের সঙ্গে যদি একটু বিষ দিয়া আপনি আমাকে মারিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার বড় পুণ্য হয়। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—না রে না! তা আর করিতে হইবে না। তোর নাড়ির গতিক যেরূপ, তাহাতে বড় জোর আর তিন মাস।"

পুরুষোত্তম বিদ্যাধরীর দিকে চাহিয়া দেখিল। পূর্বে যদি সে এক পাথর ভাত খাইত, এখন সে দুই পাথর ভাত খায়। রোগা হওয়া দূরে থাকুক, পুরুষোত্তমের নিকট ভাল ভাত আহারীয় দ্রব্য পাইয়া দিন দিন সে যেন ফুলিয়া উঠিতেছিল। আজ তিন মাস পুরুষোত্তম তাহার সেবা করিতেছিল। আজ তিন মাস আপনার মাহিনা সে দেশে পাঠায় নাই। সমুদয় টাকা বিদ্যাধরীর জন্য খরচ করিয়াছিল।

আরও তিন মাস কাটিয়া গেল। বিদ্যাধরী মরে না! ভাল ভাল জিনিষ খাইয়া তাহার শরীরে কান্তি ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। এ পর্যন্ত বিদ্যাধরীর জন্য পুরুষোত্তমের পঁচিশ টাকা খরচ হইয়াছিল। পুরুষোত্তমের মনে খটকা জন্মিল।

এক দিকে পিতেম চাকর ও গোলাপী ঝি, অপর দিকে পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ ও বিদ্যাধরী ঝি, ইহাদের মধ্যে সর্বদা ঝগড়া হইতে লাগিল। একদিন বিদ্যাধরীকে গোলাপী বলিল,—"তোমার কি বিবেচনা! আজ সকালবেলা বাবুর জন্য তুমি সন্দেশ কিনিয়া আনিলে। বাবুকে দিবার পূর্বে, বামুন ঠাকুরকে তুমি দুইবার চাটিতে দিলে, তাহার পর সন্দেশটি তুমি নিজে দশবার চাটিলে। কোন্ বলিলে যে, গোলাপী! তুই দুইবার চাট। কোন জিনিস খাইলে সকলকে ভাগ দিয়া খাইতে হয়। আমিও ঝি, তুমিও ঝি। আমাকে ভাগ দিয়া না খাইলে তোমার অধর্ম

হয়, তা জান ? মাথার উপর ভগবান আছেন, তিনি বিচার করিবেন। আর এই চাবড়া-মুখো বামনের কি আক্কেল ? আহা, মুখখানি তো নয়—ডায়মনকাটা আড়াই হাত শীতলা। পোড়ারমুখোরা আর ঠাকুর খুঁজিয়া পায় নাই, জগন্নাথকে ঠাকুর করা হইয়াছে ; না আছে নাক, না আছে কান। যে হাতে বিদ্যাধরীকে সব জিনিস দিস, জগন্নাথের মত তোর সেই হাত ঠুঁটো হউক।… ”

গোলাপীর গালিতে পুরুষোত্তমের শরীর জরজর হইল। এদিকে বিদ্যাধরীর অরুচি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বিদ্যাধরী বলিল,—“বামুন ঠাকুর, বড় অরুচি ! যদি ক্ষীরমোহন পাই, তাহা হইলে বোধ হয় কষ্টে একটা খাইতে পারি।” আবার কোন কোন দিন সে বলে,—“সরভাজা বেচিতে আসিয়াছে। বড় অরুচি। একটু যদি সরভাজা পাই, তাহা হইলে চেষ্টা করিয়া দেখি, খাইতে পারি কি না।” আবার কোন দিন বলে,—“বামুন ঠাকুর, শুনিয়াছি বাগবাজারে এক রকম সন্দেশ আছে, তাহার নাম ‘আবার খাব,’ যদি আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে বোধ হয় একটু রুচি হয়।” এইরূপ নিত্য নিত্য বিদ্যাধরীর আবদার। পুরুষোত্তম কি করিবে ? যখন এত টাকা খরচ করিয়াছে, তখন বিদ্যাধরীর সঙ্গে সহসা চটাচটি করিতে পারে না। কাজেই সেই সমুদয় দ্রব্য তাহাকে আনিয়া দিতে হয়। কিন্তু বিদ্যাধরীর মরণ হওয়া দূরে থাকুক দিন দিন সে তেলের কুপের মত মোটা হইতে লাগিল। পুরুষোত্তম তাহার শরীরের দিকে চাহিয়া দেখে আর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে। একদিন পুরুষোত্তম মুদীর দোকানে বসিয়া আছে। মুদী জিজ্ঞাসা করিল,—“ব্রাহ্মণঠাকুর ! তোমাদের বিদ্যাধরী ঝিয়ের অরুচি সারিয়াছে ?”

পুরুষোত্তম উত্তর করিল,—“বিদ্যাধরীর অরুচি ! আগে যদি সে এক পাথর ভাত খাইত, এখন সে দুই পাথর ভাত খায়।”

"বটে!" এই কথা বলিয়া মুদী একটি নিশ্বাস ফেলিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া মুদী বলিল,—"বিদ্যাধরীর ব্যায়রাম বাড়িতেছে? কবিরাজ মহাশয় তাহার নাড়ী ধরিয়া বলিয়াছেন যে, সে আর অধিক দিন বাঁচিবে না। সেই জন্য আমার নিকট হইতে প্রতিদিন সে এক ছটাক ঘি লইয়া যায়, আর পানা করিয়া খাইবার জন্য রোজ সে আধ পোয়া বাতাসা লইয়া যায়।"

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল,—"দাম দিয়া?"

মুদী উত্তর করিল,—"না; আমার ছেলেকে সে বড় ভালবাসে। বিদ্যাধরীর যাহা কিছু আছে, সে আমার ছেলেকে দিয়া যাবে। আমার ছেলের নামে সে উইল করিয়াছে।"

পুরুষোত্তমের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। মুদী তাহার সছিদ্র বাক্স হইতে উইল বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল। পুরুষোত্তমও আপনার উইল আনিয়া মুদীকে দেখাইল। তখন ইহারা বুঝিল যে, সমুদয় বিদ্যাধরীর চালাকি। দানা, অনন্ত ও টাকার লোভ দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে সে ফাঁকি দিয়া খাইতেছে। অনুসন্ধান করিতে করিতে আরও প্রকাশ পাইল যে ময়রাকে একখানি সেইরূপ উইল দিয়া বিদ্যাধরী অনেক টাকার সন্দেশ খাইয়াছে। গোয়ালাকে সেইরূপ একখানি উইল দিয়া সে দুধ, রাবড়ী ও মাখম খাইয়াছে। উড়ে দোকানদারকে উইল দিয়া সে মুড়ির চাক্তি আর তেলেভাজা বেগুনি খাইয়াছে। এইরূপ সকলকে এক একখানি উইল দিয়া, অনেক লোকের নিকট হইতে সে অনেক দ্রব্য খাইয়াছে।

একটা সামান্য স্ত্রীলোক তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে—সেই লজ্জায় পুরুষোত্তম কাহাকেও কোন কথা বলিল না। বিশেষতঃ সে ভাবিল যে,—"মাগীর কাছ হইতে এ টাকা যেমন করিয়া হউক আমার আদায় করিতে হইবে। এ কথা লইয়া যদি আমি গোল

করি, তাহা হইলে সকলে কেবল হাসিবে, আমার টাকাও আদায় হইবে না।"

কিন্তু কিরূপে সে টাকা আদায় করিবে? ঝগড়া করিলে কোন ফল হইবে না; ফাঁকি দিয়া আদায় করিতে হইবে।

পুরুষোত্তম ভাবিতে লাগিল। দুই তিন দিন চিন্তা করিয়া এক দিন সন্ধ্যাবেলা বিদ্যাধরীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার জন্য কাল আমি যে মাছের ঝোল রান্ধিয়াছিলাম, তাহা খাইয়া তুমি কেমন আছে? পেট-জ্বালা, বুক-জ্বালা করিতেছে?"

বিদ্যাধরী বলিল,—"কেন, পেট-জ্বালা, বুক-জ্বালা করিবে কেন? সে মাছের ঝোলে কি ছিল?"

পুরুষোত্তম উত্তর করিল, "এমন কিছু নয়! তবে তুমি বলিয়াছিলে যে, মরণ হইলেই বাঁচি। তোমাকে যদি কেহ বিষ দিয়া মারে, তাহা হইলে তাহার অনেক পুণ্য হয়। মনে নাই? তুমি কবিরাজ মহাশয়ের কাছ হইতে সেই জন্য ঔষধ চাহিয়াছিলে? আমি ভাবিলাম যে,—আহা! বিদ্যাধরী রোগের যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাইতেছে, বাঁচিতে ইচ্ছা নাই, তা আমি উহাকে একটু বিষ দিই, যাহাতে শীঘ্র উহার গঙ্গালাভ হয়! তাই আমাদের দেশের প্রাণমুগরো গাছের শিকড় বাটিয়া মাছের ঝোলের সহিত মিশাইয়া দিয়াছিলাম।"

বিদ্যাধরী যেন আকাশ হইতে পড়িল। শশব্যস্ত হইয়া সে বলিল,—"বলিস কি রে ···। আমাকে বিষ দিয়াছিস! বলিস কি রেউনুনমুখো ডেকরা বামুন।"

পুরুষোত্তম বলিল,—"তা তুমি তো নিজে আমাকে বার বার বলিয়াছ যে, এক তিল তোমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। এখন অমন কথা বলিলে চলিবে কেন!"

বিদ্যাধরী বলিল,—"ওরে সর্বনেশে! ওরে আঁটকুড়ো উড়ে বামুন!

তোর মনে কি এই ছিল? ওঃ! আমার পেট জ্বলিয়া গেল, আমার বুক জ্বলিয়া গেল। প্রাণ যায়, ওমা! আমার প্রাণ যায়!"

এইরূপ বলিতে বলিতে বিদ্যাধরী সেখানে ধড়াশ করিয়া শুইয়া পড়িল, আর কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমাগত বলিতে লাগিল,—"আমার পেট গেল, আমার বুক গেল, আমার প্রাণ যায়। ও গিন্নী মা! তোমার বিদ্যাধরী যায়। শীঘ্র ডাক্তার লইয়া এস। ও পিতেম! ও গোলাপী! শীঘ্র আয় রে! সকলে মিলিয়া আমার প্রাণ বাঁচা রে। ও মা কালি! আমাকে বাঁচাও মা! তোমাকে জোড়া পাঁঠা দিব মা! হে বাবা তারকনাথ! আমাকে বাঁচাও বাবা, গড়ি দিয়া আমি তোমার মন্দিরে গিয়া পূজা দিব বাবা!"

পাছে অধিক চীৎকার করে,—সে জন্য হাত দিয়া পুরুষোত্তম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। পুরুষোত্তম বলিল,—"চুপ চুপ!"

বিদ্যাধরী পুনরায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল আর বলিল, "হাঁ রে ... কি গাছের শিকড় দিয়াছিস? চুপ করিব? এখুনি আমি থানায় যাইব! তোর হাতে হাতকড়ি দিয়া তোকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইব। ও পিতেম! ওরে শীঘ্র পাহারওয়ালাকে ডাক। ... আমাকে বিষ দিয়াছে। আমার টাকা পাইবে সে জন্য বেটা আমাকে খুন করিয়াছে। ওঃ, পেট আমার জ্বলিয়া গেল! হায় হায়! আমার কি হইল!"

পুরুষোত্তম বলিল,—"চুপ চুপ! যদি তুমি একান্তই মরিতে না ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বিষের কাটান করিতে আমি জানি। সে ঔষধ ডাক্তার বৈদ্য কেহই জানে না। পুলিশের লোক যদি আমাকে ধরিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সে ঔষধ তোমাকে কে দিবে? তাহা হইলে বেঘোরে তুমি মারা যাইবে।"

বিদ্যাধরী বলিল, ... "তবে সে ঔষধ শীঘ্র আনিয়া দে।"

পুরুষোত্তম বলিল,—"সে ঔষধ আনিতে পাঁচ টাকা খরচ হইবে। আমার কাছে এখন একটি পয়সাও নাই! টাকা কোথায় পাইব যে সে ঔষধ আনিব? আজ এক শিশি খাইলে আপাততঃ তোমার প্রাণটা বাঁচিবে। কিন্তু তাহার পর আর পাঁচ ছয় শিশি খাইলে বিষটা নির্দোষ হইয়া তোমার শরীর হইতে যাইবে। আমি গরীব মানুষ! ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা আমি কোথায় পাইব। আগে যদি বলিতে যে তোমার মরিতে ইচ্ছা নাই, তাহা হইলে মাছের ঝোলের সহিত আমি বিষ দিতাম না।"

বিদ্যাধরী বলিল, ... "আমি তোকে টাকা দিতেছি। তুই আমার প্রাণ বাঁচা। তুই আমায় বাঁচা! তুই আমার প্রাণ রক্ষা কর। ওমা, পেট আর বুক জ্বলিয়া খাক হইয়া গেল।"

পেটে হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদ্যাধরী ছোট এক অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই ঘর হইতে পাঁচটা টাকা আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিয়া বলিল,—"যা বাবা। যা শীঘ্র যা। যা করিয়াছিস তা করিয়াছিস্। এখন আমার প্রাণ বাঁচা।"

পুরুষোত্তম বলিল,—"কোন ভয় নাই। ঔষধ খাইলেই তুমি ভাল হইয়া যাইবে। কাহাকেও কোন কথা বলিও না। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি। যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি ততক্ষণ খিড়কীর দিকে কলের নীচের বসিয়া মাথায় ও পেটে একটু একটু জল দিতে থাক।"

এই কথা বলিয়া পুরুষোত্তম বাড়ী হইতে বাহির হইল। বলা বাহুল্য যে, বিদ্যাধরীকে প্রকৃত সে বিষ দেয় নাই। আপনার টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত সে এইরূপ ফন্দি করিয়াছিল।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে চারি পয়সা দিয়া একটা শিশি

কিনিল। রাস্তার কল হইতে শিশিটি জলে পরিপূর্ণ করিল। তাহার পর এক পয়সার সোডা কিনিয়া সেই জলের সহিত মিশ্রিত করিল। এইরূপে মিছামিছি একটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিল। মনে করিল যে, এবার পাঁচ টাকা আদায় হইল। আর পাঁচ ছয় শিশি এইরূপ ঔষধ দিতে পারিলেই তাহার সমুদয় টাকা আদায় হইবে।

পুরুষোত্তম যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল তখন অল্প অল্প অন্ধকার হইয়াছিল। সে দেখিল যে, রান্না ঘরের নিকট পিতেম ও গোলাপী বসিয়া হুড় হুড় করিয়া কথা কহিতেছে। কয় মাস ধরিয়া পুরুষোত্তম অন্য চাকর চাকরাণীদিগকে বঞ্চিত করিয়া, বিদ্যাধরীকে অধিক মাছ ও তরকারী দিয়াছিল। সে জন্য তাহার উপর সকলের রাগ। বিষ প্রদানের কথা পাছে পিতেম কি গোলাপী শুনিয়া থাকে, সেই ভয়ে পুরুষোত্তমের প্রাণ উড়িয়া গেল।

তাহাকে অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে হইল না। পিতেম তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—"বামণ ঠাকুর! সর্বনাশ করিয়াছ। বিদ্যাধরীকে বিষ দিয়াছ। পুলিশের লোক টের পাইলে এখনি তোমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। তাহার পর তোমার ফাঁসী হইবে।"

পুরুষোত্তমের মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল—"আমি সত্য সত্য তাহাকে বিষ দিই নাই। মিছামিছি করিয়া বলিয়াছি।"

পিতেম বলিল,—"সে কথা কে বিশ্বাস করিবে? যদি বিষ দাও নাই, তবে ঔষধ আনিবার জন্য তাহার নিকট হইতে পাঁচ টাকা লইয়াছ কেন? তবে বিদ্যাধরী উন্মাদ, পাগল হইয়াছে কেন?"

আশ্চর্য হইয়া পুরুষোত্তম বলিল,—"উন্মাদ পাগল হইয়াছে? আমি সত্য বলিতেছি, তাহাকে আমি পাগল হইবার ঔষধ দিই নাই।"

পিতেম বলিল,—"সে ভয়ানক উন্মাদ হইয়াছে। আমরা দুইজনে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। অনেক কষ্টে তাহাকে আমরা একটু সুস্থ করিয়াছি। কিন্তু সুস্থ হইয়া সে আর এক সর্বনাশ করিয়াছে। বরাবর উপরে গিয়া গিন্নী-মায়ের খাটে গিয়া শুইয়াছে। মা বাগানের কলতলায় কাপড় কাচিতে গিয়াছেন। উপরে আসিয়া যদি তিনি দেখেন যে, বিদ্যাধরী তাঁহার বিছানায় শুইয়া আছে, তাহা হইলে আর রক্ষা রাখিবেন না। বাবুও এখনি বাড়ী আসিবেন। সকল কথা তখন প্রকাশ হইবে। তখন নিশ্চয় পুলিশ ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিবেন।"

পুরুষোত্তম ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল,—"দোহাই ভাই! আমি তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা কর। এখন কি করিলে আমি রক্ষা পাই, তা বল ভাই।"

পিতেম উত্তর করিল,—"আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিছুতেই তাহাকে গিন্নীর খাট হইতে উঠাইতে পারি নাই। তুমি যদি কোনরূপে তাহাকে নীচে আনিতে পার, তাহা হইলে উপায় হইতে পারে। কিন্তু আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। গিন্নী এখনি উপরে আসিবেন। নিজের বিছানায় বিদ্যাধরীকে দেখিলে তিনি আর রক্ষা রাখিবেন না।"

পুরুষোত্তম বলিল,—"তবে আমি এখনি যাই।"

গোলাপী বলিল,—"না অমনি গেলে হইবে না। তাহাকে ধরিলেই চীৎকার করিয়া সে ফাটাইয়া দিবে। তাহার চীৎকারে গিন্নী দৌড়িয়া আসিবেন, তাহা হইলে সকল কথা প্রকাশ পাইবে।"

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কি করি?"

গোলাপী ঘরের ভিতর হইতে একটা বড় থলি আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিয়া বলিল,—"উপরে গিন্নীর ঘরে গিয়া টপ করিয়া বিদ্যাধরীর

মুখে এই থলিটি পরাইয়া দিবে। তাহার পর তাহাকে ধরিবে। কিন্তু সাবধান! মুখ হইতে থলি যেন সে খুলিতে না পারে। তাহার পর জোর করিয়া তাহাকে নীচে নামাইয়া আনিবে। তাহাকে যদি আমাদের কাছে আনিতে পার, তখন আমরা তাহাকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিব।"

থলিটি হাতে লইয়া আর কোন কথা না বলিয়া পুরুষোত্তম তরতর করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। তাহার পর দ্রুতবেগে গিন্নীর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। অন্ধকার হইয়াছে, তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। গিন্নীর খাটের উপরে যে শুইয়া ছিল, পুরুষোত্তম নিকটে গিয়া সহসা তাহার মুখে থলিটি পরাইয়া দিল। দুই হাতে কোমর পর্যন্ত তাড়াতাড়ি থলিটি টানিয়া দিল। তাহার পর তাহাকে পাজা করিয়া ধরিয়া হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিল। সে চীৎকার করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু থলির ভিতর হইতে কোন শব্দ বাহির হইল না, থলির ভিতর হইতে ঘড়ঘড় আর গোঁ গোঁ শব্দ হইতে লাগিল। তাহার হাত দুইটি আবদ্ধ ছিল। যথাসাধ্য পা দিয়া সে পুরুষোত্তমকে লাথি মারিতে লাগিল, আর ছটফট করিয়া যথাসাধ্য আপনাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু উড়ে বামুন নাছোড়বন্দা। কতক টানিয়া কতক হিঁচড়াইয়া পুরুষোত্তম তাঁহাকে সিঁড়ির নিকট পর্যন্ত আনিল। এমন সময় সে থলির ভিতর হইতে আপনার দুই হাতের কতকটা বাহির করিয়া ফেলিল।

সেই দুই হাতে পুরুষোত্তমকে প্রাণপণে খিমচাইতে আর থলি ভেদ করিয়া ভিতর হইতে পুরুষোত্তমকে কামড়াইতে লাগিল, আর দুই পায়ে লাথি মারিতে লাগিল। সিঁড়ির উপর যেন গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। তাহার আঁচড়ানি কামড়ানিতে পুরুষোত্তম বড়ই

বিব্রত হইল। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে তাহাকে সিঁড়িতে নামাইতে পারিল না। দুই পা আগে যায় ত' আর এক পা পশ্চাতে গিয়া পড়ে। সিঁড়ির ঠিক উপরে তাহাকে লইয়া পুরুষোত্তম এইরূপ টানাটানি করিতেছে, এমন সময় সিঁড়ির একটু নিম্নে বাড়ীর কর্তা-বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একে উড়ে ব্রাহ্মণের সেই অদ্ভুত মূর্তি। সেই মূর্তি গুণমোড়া আর একটা মূর্তিকে টানা হেঁচড়া করিতেছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বাবু ভাবিলেন, এ ভূত, না প্রেত, না পাগল, এ কি? ঘোরতর বিস্মিত হইয়া বাবু বলিলেন,—"এ কি! এ কি!"

চমকিত হইয়া পুরুষোত্তম বাবুর দিকে চাহিয়া দেখিল। সে দেখিল যে, দুইটা পৈঠার নীচে সিঁড়িতে স্বয়ং বাবু দাঁড়াইয়া আছেন, আর তাহার ঠিক পশ্চাতে আলো হাতে করিয়া স্বয়ং বিদ্যাধরী ঝি দাঁড়াইয়া আছে।

বাবুর পশ্চাতে সিঁড়ির উপর বিদ্যাধরীকে দেখিয়া পুরুষোত্তমের প্রাণ উড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সে চটমোড়া সেই স্ত্রীলোককে সেই স্থানে ফেলিয়া দ্রুতবেগে বাবুর পাশ দিয়া সিঁড়ি হইতে নামিল। নীচে নামিয়া তৎক্ষণাৎ সে বাড়ী হইতে পলায়ন করিল। আপনার মাহিনা কি কাপড়-চোপড় লইতে আর সে ফিরিয়া আসিল না। সে পর্যন্ত পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণের আর কোন সন্ধান কেহ পায় নাই। পুরুষোত্তম যখন চলিয়া গেল, তখন বিদ্যাধরী ঝি, গোলাপী ঝি ও পিতেম চাকর সকলেই হাবা সাজিল। তাহারা বলিল,—"ব্রাহ্মণ কেন এরূপ কাজ করিয়াছে, তাহার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই আমরা জানি না।" সে জন্য এ ব্যাপার কেন যে ঘটিয়াছিল, নীলাম্বরবাবু এখনও তাহার কারণ জানিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা এই যে, উড়ে ব্রাহ্মণ পাগল হইয়াছিল, আর না হয় তাহাকে ভূতে পাইয়াছিল।

যাহা হউক নীলাম্বরবাবু তাড়াতাড়ি স্ত্রীলোকের মাথা হইতে থলিটি খুলিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য যে, থলির ভিতর হইতে তাহার স্ত্রীর মুখ বাহির হইয়া পড়িল। গিন্নী তখন জ্ঞানশূন্যা, মূর্ছিতা। অনেক কষ্টে পুনরায় তাঁহার চেতন হইল। তাহার পর ছয় মাস কাল পর্যন্ত নানা রোগে তিনি কষ্ট পাইলেন। ডাক্তার বৈদ্য দেখাইয়া অনেক টাকা খরচ করিয়া নীলাম্বরবাবু এখন তাঁহাকে ভাল করিয়াছেন। সকলে এখন সুখে-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন।

বাজীকর



প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

লোকটির বয়স ষাট বৎসরের নিতান্ত কম হইবে না। গালের মাংসগুলি ঝুলিয়া গিয়াছে, চুল ও গোঁফ বিলকুল পাকা, লাঠি ধরিয়া একটু কোঁজা হইয়া পথ চলেন। দেহের বর্ণটি এক কালে খুব সুন্দর ছিল, মলিন হইয়াছে, স্থানে স্থানে মেছেতা পড়িয়াছে, তথাপি এখনও রাগিলে গাল ও কপাল হইতে লাল আভা ফুটিয়া বাহির হয়। চোখ দুটি বড় বড়, তবে শাদা অংশগুলি ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে। এককালে ইনি সুপুরুষ বলিয়া গণ্য ছিলেন সন্দেহ নাই।

ইঁহার নাম শ্রীরামরতন বসু—অথবা প্রোফেসর বোস্। বাড়ি বরিশাল জেলায়। আজ সাত আট দিন হইল রঙ্গপুরে আসিয়াছেন; স্থানীয় টাউন হল ভাড়া লইয়া প্রতি সন্ধ্যায় ম্যাজিক দেখাইতেছেন। বাজারের নিকট টিনের ছাপ্পরওয়ালা দুইখানি দর্মাঘেরা ঘর ভাড়া লইয়াছেন। এক খানিতে রান্না হয়; অপর খানির এক দিকে এক তক্তপোশে তিনি ও তাঁহার সহকারী যুবক, সম্পর্কে ভাগিনেয়, কুলদাচরণ শয়ন করেন। অন্য দিকে আর একখানি তক্তপোশের উপর তাঁহার ম্যাজিকের আসবাব পত্র স্তূপীকৃত—তাহারই প্রান্তভাগে এক হাত চওড়া খালি স্থানটিতে ভৃত্য হরিদাস গুটি গুটি হইয়া কোন মতে রাত্রি যাপন করে। তক্তপোশ দুইখানি জরাজীর্ণ ও ছারপোকা-বহুল, তথাপি তাহার জন্য স্বতন্ত্র ভাড়া দিতে হয়।

অপরাহ্ণ কাল। ফাল্গুন মাস, কিন্তু এখনও রঙ্গপুরে বেশ শীত আছে। দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া, বালপোশ গায়ে দিয়া তক্তপোশে বসিয়া বসুজা মহাশয় ধূমপান করিতেছেন—আর ভাবিতেছেন। বারান্দায় হরিদাস বসিয়া সশব্দে মশলা বাটিতেছে; বামুন ঠাকুর তরকারি কুটিতেছে।

কুলদা গিয়াছে বিজ্ঞাপন বিলি করিতে। একখানা তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকাগাড়ি ভাড়া করিয়া, বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত সহরময় সে

"অত্যকার অত্যাশ্চর্য" ম্যাজিক খেলার বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া বেড়ায়, গাড়ীর ছাদে ইংরাজি বাজনা বাজিতে থাকে।

রামরতন বসু তামাক খাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন—ভাবিয়া কোনও কুল কিনারা পাইতেছেন না। গৃহে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং দুইটি কুমারী কন্যা। উভয় কন্যার বিবাহ-কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে বিবাহ দিতে পারিতেছেন না। বড়টির ত বৈশাখ নাগাদ না দিলেই নয়। অন্ততঃ পক্ষে একটি হাজার টাকার প্রয়োজন, কিন্তু আর্থিক অবস্থা শোচনীয়।

রামরতন যৌবন কালে বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়া পশ্চিমের প্রসিদ্ধ বাজীকর ভুরে খাঁ ও চাঁদ খাঁ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাকরেদী করিয়া ম্যাজিক শিখিয়াছিলেন। তাহার পর গৃহে ফিরিয়া বিবাহ করেন। কিছু পৈতৃক জোৎজমি ছিল, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সংসার যাত্রা করিতেন। কিন্তু তাঁহার সেই প্রথম পক্ষের স্ত্রী, স্বামীকে একে একে তিনটি কন্যা উপহার দিলেন। সে তিনটির বিবাহ দিতে দিতে জোৎজমিগুলি সমস্তই গেল। উপরন্তু কিছু ঋণও হইল। ঋণদায়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, রামরতন কলিকাতা হইতে ম্যাজিকের সরঞ্জাম কতক কতক ক্রয় করিয়া আনিলেন। তখন হইতে মাঝে মাঝে ম্যাজিক দেখাইতে বাহির হন। এই উপায়ে ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

তখনকার দিনে তিন চারি মাস ম্যাজিক দেখাইয়াই সম্বৎসরের খোরাক সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু ইদানীং পাঁচ সাত বৎসর হইতে এ ব্যবসায়ে কিছু মন্দা পড়িয়াছে। লোকে আর ম্যাজিক দেখিতে বড় চাহে না—তাহারা চাহে থিয়েটর কিংবা সার্কাস। সুতরাং এখন বৎসরে ছয় মাসেরও অধিক ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়; কিন্তু বয়স ত দিন দিন কমিতেছে না—বাড়িয়াই চলিয়াছে। আর সে শক্তি-সামর্থ্য

নাই—এ দেশ ও দেশ ছুটাছুটি করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু না করিয়া উপায়ও ত নাই!

রঙ্গপুরে আসিয়া প্রথম দুই একদিন রোজগার মন্দ হয় নাই। দুই দিনে শতাধিক টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। পল্লীগ্রাম হইতে মোকর্দ্দমা প্রভৃতি উপলক্ষে কৃষক-শ্রেণীর যে সকল লোক সহরে আসে,—স্থানীয় ভদ্রলোকেরা যাহাদিগকে "বাহের" বলেন,—তাহারা এ দুই দিন অনেকেই চারি আনার টিকিট লইয়া "তম্‌সা" দেখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশ লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের বক্তৃতা ও বুজরুকি তাহাদের পছন্দ হইল না।

প্রতিদিন ঘর ভাড়া, তক্তপোষ ভাড়া, চারিজন লোকের আহারের ব্যয়, বিজ্ঞাপন ছাপার ব্যয় ও তাহা বিতরণের জন্য গাড়ী ভাড়া, বাজনাওয়ালাদের মজুরি, টাউনহলের ভাড়া ও আলো—খরচ ত বড় সামান্য নয়! লোক না জুটিলে এমন ভাবে কয়দিন চলিবে? খরচপত্র কুলাইয়া প্রতিদিন অন্তত ২০।২৫ টাকা উদ্বৃত্ত না থাকিলে, বৈশাখ মাসে কন্যার বিবাহের আশা যে মরীচিকায় পরিণত হয়!—এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধের মনটি বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হে ভগবান! আর কষ্ট দিও না।"

প্রথমে বাদ্যের, ক্রমে তাহার সহিত ছক্কড়ের চক্রশব্দ শ্রুতিগোচর হইল; কুলদা ফিরিয়া আসিতেছে।

গাড়ী হইতে নামিয়া কুলদা গাড়োয়ানও বাজনাওয়ালাদের ভাড়া প্রভৃতি মিটাইয়া দিয়া, আগামী কল্য ঠিক দুইটার সময় তাহাদের পুনরাবির্ভাব আদেশ করিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেই রামরতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইস্কুলে কি রকম হল?"

কুলদা ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "বড় সুবিধে নয়।"

"কোন্ কোন্ ইস্কুলে গিয়েছিলে?"

"জেলা ইস্কুল, টাউন ইস্কুল, কৈলাসরঞ্জন—তিনটেতেই গিয়েছিলাম। মোটে বাহান্ন খানি টিকিট বিক্রি হয়েছে।"

"তিনটে ইস্কুলে কিছু না হবে হাজার বারো শো ছেলে, মোটে বাহান্ন খানি টিকিট বিক্রি! সবই চার আনা বোধ হয়?"

কুলদা বলিল, "না, চার আনাও আছে, আট আনাও আছে।"—বলিতে বলিতে পকেটে হাত দিয়া সে গোটা কয়েক টাকা আধুলি ও সিকি বাহির করিয়া তক্তপোষের উপর রাখিল।

রামরতন সেগুলি গণিতে লাগিলেন। কুলদা বলিল, "ছেলেগুলো বলে, ম্যাজিক আর দেখব কি, ও ত আমরাও করতে পারি।"

রামরতন বলিলেন, "হাঃ—ভারি ত মুরদ! কৈ, করনা বেটারা, দেখি। ছেলেগুলোও সব জ্যাঠা হয়ে উঠ্‌লো। আমরা যখন ইস্কুলে পড়তাম, মনে আছে, ম্যাজিক হচ্চে শুনলে ত উন্মত্ত হয়ে উঠতাম। একেবারে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। মায়ের বাক্স ভেঙ্গে পয়সা নিয়ে ম্যাজিক দেখতে ছুটতাম। আর আজ ছোঁড়াগুলো বলে কি না ম্যাজিক আর দেখব কি! হায় রে কলিকাল!"—বলিয়া তিনি উদাস দৃষ্টিতে সম্মুখে রাজপথের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কুলদাও বিষণ্ণ মুখে তক্তপোষের একপ্রান্তে বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে বলিল, "আচ্ছা মামা, ইস্কুলের ছেলেদের অর্ধমূল্য ক'রে দিলে হয় না?"

রামরতন বলিলেন, "আসবে কি? যদি বেশী ছেলে আসে ত হাপ প্রাইসে আপত্তি নেই।"

কুলদা বলিল, "হাপ প্রাইস হলে অনেকে আসে বোধ হয়।"

"আচ্ছা, কাল থেকে না হয় তাই করে দাও। সকালে উঠেই হাণ্ডবিল ছাপতে দিয়ে এস।"

কুলদা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "ছাপাখানায় বিশ বাইশ টাকা বাকী পড়ে গেছে; তারা বলেছে ধারে আর ছাপবে না। কাল গোটা পনের টাকাও অন্ততঃ দিতে হবে।"

"দেখি আজ কির কম হয়।"—বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

পরদিন বিদ্যালয়ের বালকগণের জন্য টিকিট অর্ধমূল্য করা হইল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল দর্শিল না।

তৎপরদিন ঘোষিত হইল—"অদ্য শেষ রজনী! শেষ রজনী!! শেষ রজনী!!! সকলে আসুন, দেখুন, বিস্মিত হউন।" তাহাতে অন্য দিন অপেক্ষা গোটা পাঁচ সাত টাকা মাত্র বেশী পাওয়া গেল।

পরদিন আবার বিজ্ঞাপন বিলি হইল—"বহু সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ মহোদয়গণের বিশেষ অনুরোধে, প্রোফেসর বসু অদ্য তাঁহার যাত্রা স্থগিত রাখিলেন। অদ্য রজনীতে নূতন নূতন খেলা, নূতন নূতন বিস্ময়, কেহ কখনও দেখেন নাই, শোনেন নাই, স্বপ্নেও ভাবেন নাই। এই শেষ, এই শেষ, এই শেষ।" কিন্তু রঙ্গপুরের ভবী তাহাতেও ভুলিল না।

সেদিন রাত্রে ম্যাজিক হইতে ফিরিয়া বাসায় আসিয়া রামরতন একখানি ডাকের পত্র পাইলেন। ইহা তাঁহার স্ত্রী লিখিয়াছেন।

পত্র পড়িয়া বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। স্ত্রী লিখিয়াছেন, ছোট মেয়েটির এগারো দিন জ্বর, ডাক্তার বলিয়াছে বিকারে দাঁড়াইতে পারে; ঘরে একটি পয়সা নাই, পাড়াপ্রতিবেশীর নিকট কর্জ করিয়া দুইদিন ডাক্তারের ভিজিট দেওয়া হইয়াছে; অর্থাভাবে চিকিৎসা ও পথ্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন—"তুমি যদি দিন কতকের জন্য একবার আসিতে পার ত বড়ই ভাল হয়। যদি আসিতে না পার, তবে অন্ততঃ পঁচিশটি টাকা পত্রপাঠ মাত্র আমায় পাঠাইয়া দিবে, ইহাতে কোনমতে যেন অন্যথা না হয়।"

হরিদাস তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। রামরতন হুঁকা হাতে লইয়া বসিয়া রহিলেন। এই মেয়েটি তাঁহার বড় আদরের ; তাহার রোগশয্যা যেন চোখের সমুখে দেখিতে লাগিলেন। কল্পনাচক্ষে আদরিণী কন্যার রোগখিন্ন মুখখানি দেখিতে দেখিতে, তাঁহার বাস্তব চক্ষু দুইটিতে জল ভরিয়া আসিল।

কুলদা ম্যাজিকের পোষাক ছাড়িয়া বাহিরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া গোপনে তামাক খাইতেছিল। ভিতরে আসিয়া অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, কি হয়েছে ?"

রামরতন চিঠিখানি ভাগিনেয়কে পড়িতে দিলেন। ঢিবরীর আলোকে ধরিয়া চিঠি পড়িয়া কুলদা বলিল, "কি করবেন ?"

আজিকার টিকিট বিক্রয়ের টাকা লইয়া, তহবিলে মোটে ত্রিশটি টাকা আছে। এখানকার দেনা পাওনা মিটাইতেই তাহা প্রায় শেষ হইয়া যাইবে ; চারিজনের রাহাখরচ কুলাইবে না।

রামরতন বলিলেন, "কাল সকালে উঠেই পোষ্ট আপিসে গিয়ে পঁচিশ টাকা টেলিগ্রাফ মনি অর্ডারে পাঠিয়ে দাও।"

কুলদা বলিল, "পাঠাতেও পাঁচসিকে খরচ। তারপর উপায় ?"

রামরতন ঊর্ধ্বদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

পরদিন বেলা নয়টার সময় কুলদা টাকা টেলিগ্রাফ করিয়া পোষ্টআফিস হইতে ফিরিয়া দেখিল, মাতুল তক্তপোষে বসিয়া একমনে কি লিখিতেছেন। কাছে গিয়া দেখিল, অদ্যকার বিজ্ঞাপনের জন্য হ্যাণ্ডবিল রচনায় তিনি ব্যস্ত।

লেখা শেষ হইলে কাগজখানি ভাগিনেয়কে দিয়া রামরতন কহিলেন, "ছাপাখানায় যাও। তুমি ব'সে থেকে কম্পোজ করিয়ে দু'হাজার ছাপতে অর্ডার দিয়ে এস। যেন দুটোর মধ্যে পাই।"

কুলদা কাগজখানা পড়িতে পড়িতে বলিল, "কিন্তু আজ তাদের গোটা দশেক টাকা দেবো বলে রেখেছিলাম যে, ছাপতে আবার গোলমাল না করে।"

রামরতন বলিলেন, "তাদের বোলো, কাল সকালে তাদের সমস্ত বাকী টাকা চুকিয়ে দেবো, পাইপয়সা বাকী রাখব না।"

কুলদা পুনরায় হ্যাণ্ডবিলের খসড়া খানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এটা লিখে ত দিলেন, কিন্তু—কি রকম হবে—কিছু যে বুঝতে পারছিনে! শেষকালে একটা ধাষ্টমো না হয়!"

রামরতন রাগিয়া বলিলেন, "তু তু তুমি ছাপিয়েই আন না! কি রকম হবে না হবে সে তখন জানতে পারবে। যাও, দেরী কোরো না।"

কুলদা চিন্তিত মুখে প্রস্থান করিল। তাহার চিন্তার কারণ এই যে, হ্যাণ্ডবিলে অদ্য শেষতম—নিতান্তই শেষতম রজনীতে যে নূতন ম্যাজিক দেখাইবার কথা ঘোষণা করা হইতেছে, তাহা শুধু দর্শকমণ্ডলীর নহে—কুলদার পর্যন্ত অশ্রুতপূর্ব। মাতুল এ ম্যাজিক এতাবৎকাল কোথাও দেখান নাই: এমন কি তিনি প্রসঙ্গক্রমেও কখনও এ ম্যাজিকের উল্লেখ করেন নাই। অপর কোনও ম্যাজিকওয়ালা যে ইহা দেখাইতে পারে তাহা পর্যন্ত কুলদা কস্মিনকালেও শুনে নাই। সে ভাবিতে লাগিল, মাতুল এরূপ বিজ্ঞাপন কেন দিতেছেন? গতকল্য সারারাত্রি তিনি ঘুমান নাই। খালি ছটফট করিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে উঠিয়া আলো জ্বালিয়া তামাক খাইয়াছেন। দুশ্চিন্তায় তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি, কুলদা কিছুই বুঝিতে পারিল না। এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া লোক জড় করিয়া, শেষে ফাঁকি দিলে, অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না। রঙ্গপুরের ছাত্রগণ যেরূপ দুর্দান্ত, প্রহার পর্যন্ত করিতে পারে!

যাহা হউক, মাতুলের হুকুম কুলদা তামিল করিতে গেল।

প্রেসের ম্যানেজার বাবু তখনও আসেন নাই। কম্পোজিটারগণ

বিজ্ঞাপনের কপি পড়িয়া কুলদাকে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "হ্যাঁ মশায়, এ কি সত্যি?"

কুলদা গম্ভীর ভাবে বলিল, "সত্যি অবশ্য নয়, ইন্দ্রজাল।"

সে আপনাদের ইন্দ্রজালই হোক চন্দ্রজালই হোক্,—এতে যা সব লেখা আছে, আমরা তা চোখে দেখতে পাব ত?"

"নিশ্চয় পাবেন।"

"তবে মশায়, আজকে আমাদের পাস দিতে হচ্চে। আমরা তিনজন কম্পোজিটর, জমাদার, আর ম্যানেজার বাবুও যেতে চাইবেন নিশ্চয়—এই পাঁচজনের পাস লিখে দিয়ে যান।"

"তা দিচ্চি। কিন্তু হ্যাণ্ডবিলগুলি ছটোর মধ্যেই চাই।"

"ছটো কি বলছেন!—একটার মধ্যেই ছাপা হ্যাণ্ডবিল আপনাদের বাসায় আমরা পৌঁছে দেবো। পাসখানা লিখুন।"

বিজ্ঞাপনটিতে এইরূপ লেখা ছিল :—

শেষ রজনী **শেষ রজনী**

অদ্য নিতান্তই শেষ রজনী

বিপরীত ব্যাপার—লোমহর্ষণ কাণ্ড

অদ্য সর্বজন সমক্ষে, প্রোফেসার বসু

একটা জীবন্ত মানুষ ধরিয়া

ভক্ষণ করিবেন

আবার ইন্দ্রজাল প্রভাবে সর্বজনসমক্ষে

তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিবেন ইত্যাদি

আহারাদি করিয়া, কুলদা বিজ্ঞাপন লইয়া গাড়ীতে বাহির হইল। রামরতন বাজাওলাদের বলিয়া দিলেন, আজ তোরা খুব জোরে জোরে বাজাবি। কাল আমরা চ'লে যাব—তোদের ভাল করে বখশিস্ দিয়ে যাব।"

বেলা ১টা হইতে বিকাল ৫টা অবধি সহরময় বিজ্ঞাপনটি রাশি রাশি বিতরিত হইল।

ইহা পাঠ করিয়া সহরময় একটা হৈ হৈ ব্যাপার পড়িয়া গেল। অন্য দিনের ন্যায় অদ্যও সাড়ে সাতটায় খেলা আরম্ভ। কিন্তু ছ'টার সময় রামরতন বাসায় বসিয়া সংবাদ পাইলেন, টাউনহলের মাঠে ইতিমধ্যেই লোক জমিতে সুরু হইয়াছে। ভাগিনেয়কে বলিলেন, "ঠাকুরকে বল, চট্ পট্ তৈরী হয়ে নিক। রান্না যদি কিছু বাকী থাকে, নামিয়ে রাখুক, ফিরে এসে তখন হবে।"

খেলার সময় টিকিট বিক্রয়ের ভার এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরের উপর। হরিদাস ও কুলদা গেটে বসিয়া থাকে, টিকিট লইয়া শ্রেণী অনুসারে দর্শকগণকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। রামরতন হরিদাসকে বলিলেন, "আমাদের ফাষ্টো কেলাস দু-টাকার টিকিট এক সারি চেয়ার ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আর, এক টাকার সেকেন কেলাস তিন সারি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, দড়ি খুলে, এই চার সারিই আজ ফাষ্টো কেলাস বানিয়ে দিও। বাকী অর্দ্ধেকে সেকেন কেলাস, থার্ডো কেলাস, ফোর্থো কেলাসে দু' তিন সারি বেঞ্চি রেখ মাত্র।"

কুলদা বলিল, "তাতে চার আনার টিকিট বড্ড ক'মে যাবে যে!"

রামরতন বলিলেন, "তা যাক। গুণতি মতন টিকিট নিয়ে বসবে।

এক কেলাসের টিকিট ফুরিয়ে গেলেই, তার উঁচু কেলাসের টিকিট বেচবে।"

তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া, জিনিসপত্র ও লোকজন সহ রামরতন রওয়ানা হইলেন। টাউন হলে পৌঁছিয়া দেখিলেন, প্রাপ্ত সংবাদ মিথ্যা নহে,—মাঠে বিস্তর লোক টিকিটের জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বামুন ঠাকুর দ্বারের কাছে গিয়া টিকিট বিক্রয় করিতে বসিল। কুলদা ও হরিদাস গেটে বসিল। রামরতন ষ্টেজের উপর পর্দার আড়ালে ম্যাজিকের সরঞ্জামগুলি গুছাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সাড়ে সাতটার সময় পর্দা উঠিলে রামরতন দেখিলেন, হল একেবারে কাণায় কাণায় পূর্ণ; প্রথম শ্রেণীর দুই টাকা মূল্যের সমস্ত চেয়ার বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; স্বয়ং পুলিশ সাহেব সস্ত্রীক প্রথম সারির মধ্যস্থলে উপবিষ্ট। অপরাপর শ্রেণীর সমস্ত আসনই পূর্ণ—উভয় পার্শ্বের দেওয়ালের নিকটও বিস্তর লোক দণ্ডায়মান। ষ্টেজ হইতেই রামরতন ঝুঁকিয়া পুলিশ সাহেব তদীয় মেমকে ভক্তিভরে সেলাম করিলেন।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথম তাসের কৌতুক। ষ্টেজ হইতে নামিয়া, প্রথম সারির দর্শকগণের সমক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রামরতন তাসক্রীড়া দেখাইতে লাগিলেন। তাহার পর ভৌতিক ফুলগাছ জন্মানো, দর্শকের ঘড়ি লইয়া চূর্ণীকরণ এবং অবশেষে তাহা অভগ্ন অবস্থায় প্রত্যর্পণ, ছড়ির মধ্যে অঙ্গুরীয় প্রবেশ, কুলদাচরণকে হিপ্নটাইজ করিয়া এবং তাহার চোখ বাঁধিয়া তাহার কর্তৃক দর্শকলিখিত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান ইত্যাদি মামুলি খেলাগুলি শেষ হইতে প্রায় নয়টা বাজিল।

অবশেষে রামরতন বলিলেন—

"ভদ্রমহোদয়গণ, এবার আমি একটা নূতন খেলা আপনাদিগকে

প্রদর্শন করিব—সেটি জীবজন্তু মনুষ্যভক্ষণ। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার। ঔরংগজেব বাদশাহের আমলে জনৈক মুসলমান ফকির কর্তৃক ইহা প্রথম প্রদর্শিত হয়। এই অত্যদ্ভুত ক্রীড়াটি ভারতীয় প্রতিভারই অক্ষয় নিদর্শন। পাশ্চাত্য যাদুকরগণ ইহা অবগত নহে—ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয়। আমি বহু সাধনায় গুরুর নিকট ইহা শিক্ষা করিয়াছি। একটি মনুষ্যকে আপনাদের সমক্ষে ক্রমে ক্রমে আমি সম্পূর্ণ রূপে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব; এবং অবশেষে উহাকে অক্ষত দেহে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব। দর্শকগণের মধ্যে কে ভক্ষিত হইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া এখানে আসুন।"

রামরতন দর্শকমণ্ডলীর উপর তাঁহার সপ্রতীক্ষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সভামধ্য হইতে একটা গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল। এক মিনিট গেল, দুই মিনিট গেল, তিন মিনিট গেল—কিন্তু ভক্ষিত হইবার জন্য কেহ অগ্রসর হইল না।

রামরতন তখন বলিলেন—"মহাশয়গণ, আপনারা কি ভয় পাইতেছেন? ভয়ের কোনও কারণ নাই। আমি মনুষ্যটিকে আহার করিয়া, আবার তাহাকে বাঁচাইয়া দিব। আপনারা তখন সকলেই দেখিবেন, তাহার দেহে কোনও আঘাতের চিহ্নমাত্রও নাই। কে আসিবেন, আসুন।"

রামরতন পূর্ণ দুই মিনিট কাল অপেক্ষা করিলেন। সভাস্থলে বহু লোকের চাপা গলায় কথা ও চাপা হাসির শব্দ শ্রুত হইল। কিন্তু কেহই খাদিত হইতে আগ্রহ দেখাইল না।

অবশেষে রামরতন বলিলেন, "আপনারা কি ভয় করিতেছেন যে পাছে আমি তাহাকে বাঁচাইয়া দিতে সমর্থ না হই? সে আশঙ্কা করিবেন না মহাশয়গণ, ইহা নির্দোষ আমোদ মাত্র। আমি যদি খাইয়া আবার বাঁচাইয়া দিতে না পারি, তাহা হইলে ত আমি খুনী—খুনের

দায়ে পড়িব। স্বয়ং ধর্মাবতার পুলিস সাহেব বাহাদুর, পুলিসের বড় ইন্‌স্পেক্টর বাবু, স্থানীয় হাকিমগণের মধ্যে অনেকেই আজ দয়া করিয়া এখানে পদধূলি দিয়াছেন দেখিতেছি ; যদি আমি মানুষটিকে আবার বাঁচাইয়া দিতে না পারি, তবে ইঁহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া ফাঁসি দিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা ঘটিবে না। কোনও ভয় নাই কে আসিবেন আসুন।”

তৃতীয় শ্রেণীর একখানি বেঞ্চিতে কয়েকজন ছাত্র বসিয়া গোলমাল ও হাসিতামাসা করিতেছিল ; তাহারা ঠেলিয়া এক বালকে উঠাইয়া দিল। সে উঠিয়া ষ্টেজের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র, সমস্ত দর্শক তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

বালক ক্রমে ষ্টেজের পাদদেশে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। রামরতন বলিলেন, “উঠে এস বাবা, উঠে এস। কোনও ভয় নেই তোমার।”

বালকের বয়স পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ বর্ষ মাত্র। রঙ্গপুর টেক্‌নিক্যাল স্কুলে পড়ে, সাহসী বলিয়া সহপাঠী মহলে তাহার খ্যাতি আছে। কিন্তু ষ্টেজের উপর উঠিতে তাহার পা দুটি কাঁপিতে লাগিল।

রামরতন বালককে তাহার গাত্রবস্ত্র খুলিয়া ফেলিতে বলিলেন। দেহের ঊর্ধ্বভাগ নগ্ন করিয়া বালক দাঁড়াইল। ভয়ে তাহার বুকটি দুরু দুরু করিতেছে, মুখখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে।

রামরতন দর্শকগণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—“দেখুন ভদ্রমহোদয়গণ, আমি এই বালককে ভক্ষণ করি।”—বালকের দিকে চাহিয়া মাথা হেলাইয়া বলিতে লাগিলেন—“বাঃ বাঃ—খাসা নধর দেহ। অনেক দিন মানুষ খাইনি, কচি মাংস বেশ লাগবে খেতে।”—বলিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া, তদ্দ্বারা নিজ ওষ্ঠযুগল সিক্ত করিতে লাগিলেন।

হলভরা সমস্ত লোক একেবারে নিস্তব্ধ। একটি সূচ পড়িলে তাহার শব্দটুকু শুনা যায়। বালকের একবার ইচ্ছা হইল, সরিয়া পড়ে—কিন্তু

লোকলজ্জায় সে তাহা করিতে পারিল না। উভয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কোনমতে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রামরতন সহসা বালকের স্কন্ধোপরি সজোরে এক কামড় বসাইয়া দিলেন।

"বাপরে—মারে—উহুহু"—বালকের এই আর্ত্ত চীৎকারে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। দর্শকগণের মধ্যে কয়েকজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "ওকি মশায়, ওকে কামড়ালেন কেন?"

রামরতন বলিলেন, "কামড়াব না ত খাব কি ক'রে মশায়? অত বড় মানুষটা ত গপ্ করে গিলে খেতে পারিনে, একটু একটু ক'রে আমায় খেতে হবে ত! সমস্তটা খাব, খেয়ে ইন্দ্রজালের জোরে বাঁচিয়ে দেবো।"

ইহা শ্রবণমাত্র, বালক ষ্টেজ হইতে এক লম্ফ দিয়া, খোলা দরজায় দণ্ডায়মান প্রহরীকে ঠেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

হলের ভিতর তখন মহা গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। কেহ কেহ উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল—"এ কি জুয়াচ্চুরি না কি মশায়? ইন্দ্রজালের প্রভাবে খাবেন ত কামড় দিলেন কেন? সব বুঝি ফাঁকি?"

রামরতন দেখিলেন, হলের অধিকাংশ লোকই অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, কেবল পুলিশ সাহেব ও তাঁহার মেম মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। রামরতন কহিলেন, "কেন মশায় ফাঁকিটা আমি কি দিলাম। বিজ্ঞাপন পড়ে দেখুন. ইন্দ্রজাল প্রভাবে খাব বলিনি, ইন্দ্রজাল প্রভাবে বাঁচিয়ে দেবো বলেছি। আগে খাই, তবে ত বাঁচাব। যার ইচ্ছে হয় আসুন না, বিজ্ঞাপনে যে খেলা দেখাব তাই দেখাচ্চি।"

দর্শকগণ উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিল, "থাক্ থাক্ ঢের হয়েছে, আর খেলা দেখাতে হবে না। আমরা তোমায় কি রকম খেলা

দেখাই তা দেখ। হল থেকে বেরোও দিকিন একবার জোচ্চোর কাঁহেকা!"

রামরতন ক্রন্দনের মত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ—অ্যাঁ? তোমরা আমায় মারবে না কি? কেন, আমি কি দোষ করেছি? (যোড়হস্তে পুলিস সাহেবের পানে চাহিয়া) দোহাই গবর্ণমেণ্টের, দোহাই ইংরেজ বাহাতুরের—আমি নির্দোষী। তোমরা আমার হ্যাণ্ডবিল প'ড়ে দেখ, আমি কি জুচ্চুরি করেছি।

পুলিস সাহেব তাঁহার মেমকে হাসিতে হাসিতে কি বলিতে ছিলেন, রামরতনের ক্রন্দন ও দোহাই শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "এ বুঢ়া, টুমি ভয় করিও না। কেহ টোমায় মারিটে পারিবে না। (পশ্চাৎ ফিরিয়া) বাবুলোগ, টোমরা সব চুপ্‌চাপ আপন আপন গৃহে গমন কর। বে-আইনি জনটা করিলে গ্রেফটার হইবে।"

অতঃপর দর্শকগণ গজগজ করিতে করিতে উঠিয়া বাহির হইতে লাগিল। পুলিস সাহেব চুরুট মুখে করিয়া তথায় নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হল খালি হইয়া গেলে, রামরতন ষ্টেজ হইতে নামিয়া পুলিস সাহেব ও তাঁহার মেমকে তুই দীর্ঘ সেলাম করিয়া, করযোড়ে বলিলেন, "আজ হুজুর ছিলেন ব'লেই এ গরীবের প্রাণ বাঁচলো। আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্যে যদি দয়া ক'রে তু'জন কনেষ্টবল হুকুম করে দেন তবে ভাল হয়; কি জানি রাস্তায় যদি—"

পুলিস সাহেব রামরতনের স্কন্ধে মৃত্যু মৃত্যু করাঘাত করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"টুমি বড় শয়টান আছ—A downright scoundrel। পুলিসের উপযুক্ট লোক। টোমার বয়স যদি কম হইট আমি টোমায় পুলিশে ডারোগা কার্য দিট। এখন গৃহে যাও—কল্য প্রাটেই টুমি রঙ্গপুর পরিট্যাগ করিয়া যাইবে।"—মেমসাহেবও হাসিতেছিলেন।

পুলিস সাহেবের হুকুম অনুসারে তথায় উপস্থিত দুইজন কনেষ্টবল রামরতনকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিল।

পরদিন পাওনাদারগণের প্রাপ্য নিঃশেষে চুকাইয়া দিয়া, বাকী টাকার রাশি পুটুলি বাঁধিয়া লইয়া, রামরতন রঙ্গপুরের মায়া পরিত্যাগ করিলেন। গৃহে পৌঁছিয়া দেখিলেন, ঈশ্বরকৃপায় মেয়েটির পীড়ার অনেকটা উপশম হইয়াছে।

মেঘনাদ বধ



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দত্তদের বাড়িতে কালীপূজা উপলক্ষে পাড়ার সখের থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা হইতেছে। মেঘনাথ বধ হইবে। ইতিপূর্বে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার বেশি চোখে দেখি নাই। সারা দিন আমার নাওয়া-খাওয়া নাই বিশ্রামও নাই। ষ্টেজ-বাঁধার সাহায্য করিতে পাইয়া একেবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। শুধু তাই নয়। যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়া-ছিলেন। সুতরাং ভারি আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীনরুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয় ত বা আমাকে দেখিলে এক-আধ বার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! সমস্তদিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাঁহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রীনরুমের দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম; রামচন্দ্র কতবার আসিলেন, গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি-ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গেছে।

রাত্রি দশটার পর থিয়েটারের পয়লা 'বেল' হইয়া গেলে, নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই হতশ্রদ্ধ হইয়া সুমুখে আসিয়া একটা জায়গা দখল করিয়া বসিলাম। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত অভিমান ভুলিয়া গেলাম!

সে কি প্লে! জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাণ্ড! তাঁহার ছয় হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা চার সাড়ে-চার হাত। সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ি ছাড়া উপায় নাই। অনেক দিনের কথা। আমার সমস্ত ঘটনা মনে নাই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সেদিন যে বিক্রম

প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হারাণ পলসাঁই ভীম সাজিয়া মস্ত একটা সজিনার ডাল ঘাড়ে করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়াও তেমনটি করিতে পারিতেন না।

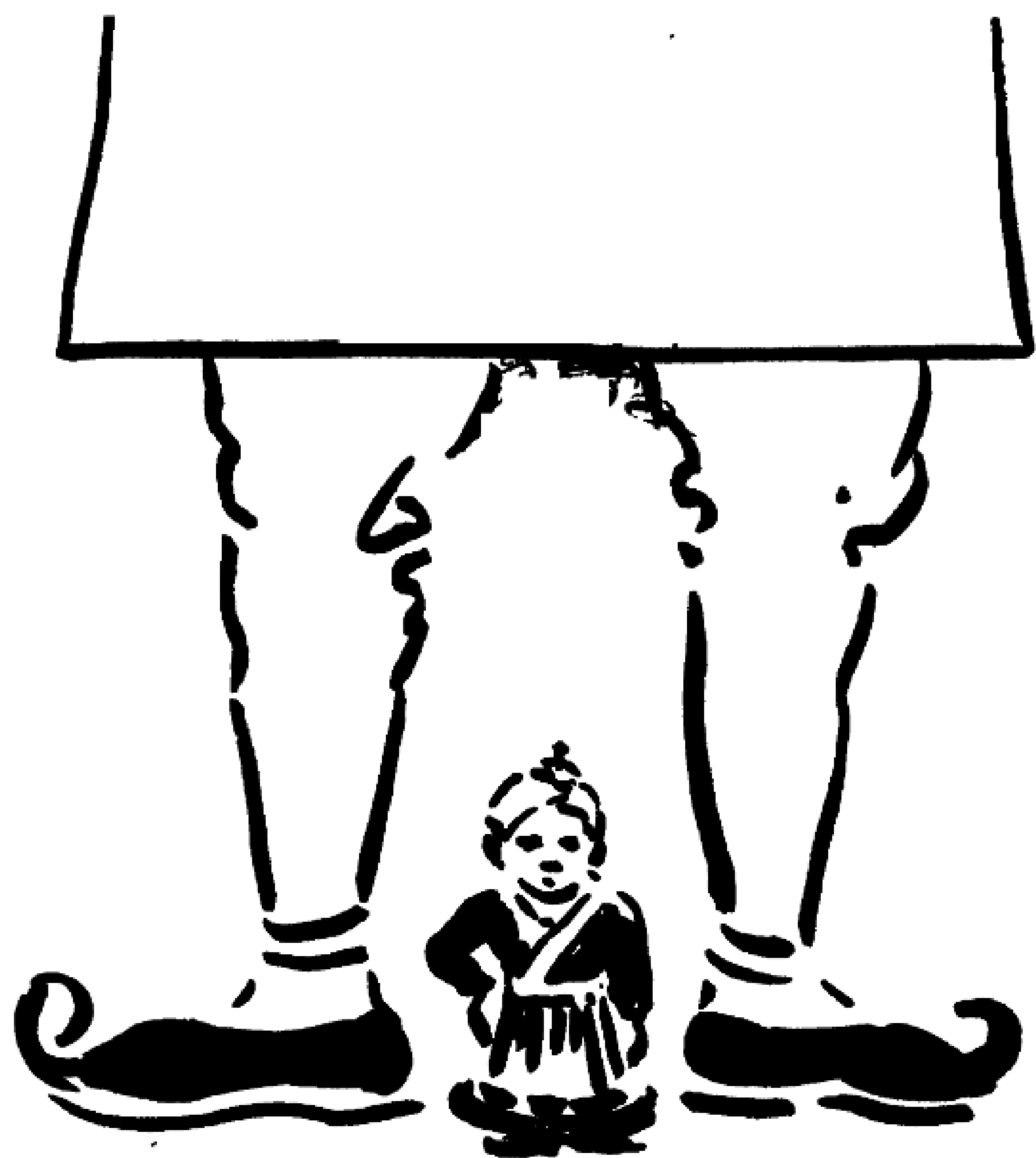
ড্রপ-সিন উঠিয়াছে।

বোধ করি বা তিনিই লক্ষ্মণ হইবেন—অল্প-স্বল্প বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এমনি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত ষ্টেজটা মড়মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল—ফুটলাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উল্টাইয়া নিবিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল! তাঁহাকে বসিয়া পড়ার জন্য কেহ বা সভয়ে চীৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল, কেহ বা সিন ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল—কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ! কাহারও কোন কথায় বিচলিত হইল না। বাঁ হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া, পেন্টুলানের মুট চাপিয়া ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব!

অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নয়—শুধু ডান হাত, এবং শুধু তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে? অবশেষে তাহাতেই জিত! বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

বুড়ো রাজা খোকা রাজার গল্প



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুই রাজা থাকেন—বুড়ো রাজা আর খোকা রাজা। দু'জনে একদিন দিকবিজয় করতে চল্লেন।

বুড়ো রাজা চল্লেন বড় বড় হাতি, ঘোড়া, কামান, বন্দুক সাজিয়ে, মস্ত মস্ত জয়ঢাক পিটিয়ে বুড়ো বুড়ো সেনাপতির সঙ্গে বড় বড় রাজত্ব জয় করতে করতে। এদিকে খোকা রাজা, তিনি চল্লেন ছোটলোকের সাজে, ছোট ছোট খেলবার কামান, বন্দুক, হাতি, ঘোড়া নিয়ে, ছোট একটা পুঁটলি বেঁধে ছোট রাজত্ব জয় করতে—বুড়ো রাজার পিছনে-পিছনে।

মস্ত বড় এই পৃথিবী—বুড়ো রাজা ক্রমে ক্রমে তা জয় করে ফেল্লেন—এমন সময় চর এসে খবর দিলে—মহারাজ, শুনে এলুম, খোকা রাজা ছোট রাজ্য নিয়ে সুখে রয়েছে।

বুড়ো রাজা বল্লেন—তাকে বল, আমি পৃথিবী জয় করে নিয়েছি—সে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র যাক্।

দূত গেল খোকা রাজার কাছে। কিন্তু খোকা রাজার রাজ্য এত ছোট যে দূত দেখতেই পেলে না কোথায় বা রাজা, কোথায় বা রাজত্ব। সে ফিরে এসে বুড়ো রাজাকে খবর দিলে—চক্ষুর অগোচর সে রাজত্ব; সেখানে প্রবেশ করা ভারী কঠিন।

বুড়ো রাজা বড়ই খাপ্পা হয়ে বল্লেন—চলো আমি নিজেই যাবো।

বুড়ো রাজা মস্ত মস্ত হাতি, ঘোড়া, রথ, রথী নিয়ে চল্লেন পৃথিবী কাঁপিয়ে। কিন্তু খোকা রাজার সহর এত ছোট যে সেখানে হাতি গলে না, ঘোড়া চলে না। বুড়ো মন্ত্রীরা মন্ত্রণা দিলে—সবাই চোখে অণুবীক্ষণ লাগিয়ে যুদ্ধ চল!

বুড়ো সেনাপতি বল্লেন—এতে করে চোখ চলবে, গোলাগুলি চলবার উপায় হবে না।

বুড়ো রাজা বল্লেন—দেখাই যাক্ না।

যুদ্ধ বাধলো—সেনাপতির পায়ের তলা দিয়ে খোকা রাজার ফৌজ গলে পালালো। তীর, কামান আন্দাজ ঠিক করতে না পেরে বাতাসে হানা দিতে থাকলো, নয়তো আকাশে ঘুরে ঝুপ ঝাপ বুড়ো রাজার ছাউনির উপর পড়তে লাগলো। বড়-বড় অস্তর—সে সব বড় জিনিষকেই লক্ষ্য করে, ছোটকে দেখতে পায় না। বুড়ো রাজা, বুড়ো বুড়ো মন্ত্রী, বুড়ো বুড়ো সেনাপতি ফাঁপরে পড়ে খোকা রাজার সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন।

খোকা রাজা হেসে বল্লেন—দাদা, তুমি তোমার মস্ত রাজত্ব নিয়ে সুখে থাক। ছোটতে বড়তে সন্ধি হলে কি হয় তা জান না কি?

বুড়ো রাজা বল্লেন—তা আর জানি নে?

বুড়ো মন্ত্রীরা বল্লেন—তা আর জানেন না?

বুড়ো সেনাপতি বল্লেন—এত বড় পৃথিবীটা জয় করে এলেন বুড়ো রাজা, এটুকু আর জানেন না?

খোকা রাজা বল্লেন—তা হলে এবারকার মত এইটুকু জেনেই ঘরে চলে যান সকলে। আরো কি জানতে চান?

বুড়ো রাজা রেগে বল্লেন—টুটি চেপে ধরলে খোকারাজা যে কি করে তাই জানতে চাই। বলেই বুড়ো রাজা নিজের মস্ত মুঠোয় খোকা রাজা, মায় তার রাজত্বটা পর্যন্ত কসে চেপে ধরলেন। জল যেমন গলে পালায় তেমনি বুড়ো রাজার মোটা-মোটা আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে খোকা রাজা, মায় তার সিংহাসন, রাজপুরী সমস্তই বেরিয়ে গেল। বুড়ো রাজা হাত খুলে দেখলেন মুঠো খালি; বুড়ো আঙ্গুলের গোড়ায় মৌমাছির হুলের মতো একটা কি বিঁধে রয়েছে। যন্ত্রণায় বুড়ো রাজার আঙ্গুলটা ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

পারম্পর্য



মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কর্তা বুড়ো হয়েছেন, একটা খানসামা না হলে আর চলে না। এমন খানসামা চাই যে নিজেই সব দেখে শুনে কাজকর্ম করবে, কর্তাকে তার জন্যে বকাবকি করতে হবে না। অনেক খোঁজাখুজির পর একটি চট্‌পটে খানসামা জুটলো। সে বল্লে দশঘরার নবাববাবুর বাড়িতে তার খানসামাগিরির শিক্ষা আরম্ভ, তার পর চোরকাঁটার জমিদার, শেষে ঘুঘুচরের মহারাজ—এঁদের কাছে কাজে সে হাত পাকিয়েছে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কোনো কাজ শিখতে তার বাকি নেই। শুনে কর্তা ভারি খুসি, বল্লেন, "বেশ, তুমিই থাক। কাজকর্ম সব দেখে শুনে নাও।" সে কাজকর্ম বুঝে নিচ্ছে এমন সময় কর্তা তাকে ডেকে বল্লেন—"ওহে, কাজ তো বুঝে নিচ্ছ, কাজের পারম্পর্য বোঝ?" সে মাথা চুলকে বল্লে—"আজ্ঞে না কর্তা, টুলো-পণ্ডিতের ঘরে তো কাজ করিনি যে ও কথার মানে বুঝবো!" কর্তা বল্লেন—"পারম্পর্য মানে এই পর পর আর কি! যেমন ধর তোমায় তেল আনতে বল্লুম, তুমি তখনই বুঝবে, এর পর স্নানের জলের দরকার, তারপরই ভাতের ঠাঁই করে ভাত, তারপর তামাক, তারপর ঘুমের বিছানা তৈরি! এই এক হুকুম থেকেই তোমাকে তার পরের পরের কাজগুলি বুঝে নিয়ে করতে হবে—একেই বলে কাজের পারম্পর্য! বুঝলে?"

খানসামা জোড় হাত করে বল্লে—"আজ্ঞে বুঝলুম।"

কর্তা বল্লেন—"দেখ, এখানে যদি চাকরি বজায় রাখতে চাও, তাহলে ঐ পারম্পর্য বুঝে কাজ করতে হবে।"

খানসামা বল্লে—"যে আজ্ঞে।"

সেই দিন রাত্রে কর্তার একটু মাথা ধরলো। তিনি নতুন খানসামাকে ডেকে পাঠালেন মাথাটা একটু টিপে দেবার জন্যে। দু মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, আধঘণ্টা গেল, একঘণ্টা গেল, খানসামার দেখা নেই। কর্তা বিরক্ত হয়ে ছটফট করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন শেষ

রাত্রি তখন খানসামা এসে দরজা ঠেলাঠেলি করে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লো। কর্তা চেঁচিয়ে উঠে বল্লেন, "কেরে ?"

"আজ্ঞে আমি হুজুর !"

কর্তা রেগে উঠে বল্লেন—"এতক্ষণে আসবার তোমার ফুরসুৎ হোলো —পাজী ব্যাটা !"

"আজ্ঞে কি কবব হুজুর; পারম্পর্য করতে করতে একটু দেরি হয়ে গেল।"

"এতক্ষণ ধরে কি পারম্পর্য করছিলি ব্যাটা !"

"আজ্ঞে আপনি বলে পাঠালেন আপনার মাথা ধরেছে, তাই বুঝলুম এরপরই ডাক্তার ডাকতে হবে, ছুটলুম ডাক্তারের বাড়িতে। ডাক্তার এলেই ওষুধ দেবে তো? ছুটলুম দাওয়াই-খানায় তাদের বলতে তাড়াতাড়ি দোকান না বন্ধ করে। ওষুধ খেয়ে যদি আপনার অসুখ না সারে তাহলেই তো পটল তুলবেন—সেই ভেবে উকিলকে খবর দিতে ছুটলুম যদি উইল করেন। তারপর শ্মশানের ভাবনা। খাট জোগাড় করা, কাঠ জোগাড় করা, লোকজন ডাকা। তারপর শ্রাদ্ধ—বামুন পুরুতকে খবর দেওয়া, কি কি জিনিস চাই তার ফর্দ করা—সব এই একরাত্রের মধ্যে করে ফেলেছি কর্তা! দেখুন না হুজুর আপনার বৈঠকখানায় লোক গিস্‌গিস্ করছে। এখন কিছু টাকা ছান, দেনাগুলো মেটাই। তারপর নেমন্তন্ন করতে বেরুতে হবে।"

কর্তা সব শুনে খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে রইলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"পারম্পর্য তো এখনো শেষ হয় নি বাপু!"

খানসামা অবাক হয়ে বল্লে—"তাই নাকি, আর তো আমার কিছু মাথায় আসছে না কর্তা!"

"মাথায় এনে দিচ্ছি তোমার! রোসো না"—বলে আবার বল্লেন —"কর্তার মৃত্যুর পর তার খানসামা কি আর থাকে ?"

"আজ্ঞে কর্তা" বলে খানসামা মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগল।

কর্তা বল্লেন—"তা হচ্ছে না বাপু, পারম্পর্য যখন এতদুর পর্যন্ত টেনেছ, তখন ওর শেষ অবধি তোমায় নিয়ে যেতে হবে।"

খানসামা কটমট করে চেয়ে বল্লে—"আচ্ছা!" বলে ঝট করে বেরিয়ে গেল।

কর্তা ভয়ে ভয়ে ভাবতে লাগলেন চাকরটা এর পরেও পারম্পর্য করতে অগ্রসর হয় কিনা।

দাশুর খ্যাপামি.



সুকুমার রায়চৌধুরী

স্কুলের ছুটির দিন। স্কুলের পরেই ছাত্র সমিতির অধিবেশন হবে, তাতে ছেলেরা মিলে অভিনয় করবে। দাশুর ভারি ইচ্ছা ছিল সেও একটা কিছু অভিনয় করে। একে ওকে দিয়ে সে অনেক সুপারিসও করিয়েছিল, কিন্তু আমরা সবাই কোমর বেঁধে বললাম, সে কিছুতেই হবে না। সেই তগতবার যখন আমাদের অভিনয় হয়েছিল তাতে দাশু সেনাপতি সেজেছিল; সেবারে সে অভিনয়টা একেবারে মাটি করে দিয়েছিল। যখন ত্রিচড়ের গুপ্তচর সেনাপতির সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করে বলল, "সাহস থাকিলে তবে খোল তলোয়ার—"দাশুর তখন "তবে আয় সম্মুখ সমরে" বলে তখনি তলোয়ার খুলবার কথা। কিন্তু দাশুটা, আনাড়ির মত টানাটানি করতে গিয়ে তলোয়ার তো খুলতেই পারল না, মাঝখেকে ঘাবড়ে গিয়ে কথাগুলোও বলতে ভুলে গেল। তাই দেখে গুপ্তচর আবার "খোল তলোয়ার" বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। দাশুটা এমনি বোকা, সে অমনি "দাঁড়া, দেখছিস না বকলস আটকিয়ে গেছে" বলে চেঁচিয়ে তাকে এক ধমক দিয়ে উঠল। ভাগ্যিস আমি তাড়াতাড়ি তলোয়ারটা খুলে দিলাম তা না হলে ঐখানেই অভিনয় বন্ধ হয়ে যেত। তারপর শেষের দিকে রাজা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "কিবা চাহ পুরস্কার কহ সেনাপতি," তখন দাশুর বলবার কথা ছিল "নিত্যকাল থাকে যেন রাজপদে মতি," কিন্তু দাশুটা তা না বলে, তারপরের আর এক লাইন আরম্ভ করেই, হঠাৎ জিব কেটে "ঐ যাঃ! ভুলে গেছিলাম" বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। আমি কটমট করে তাকাতে সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে ঠিক লাইনটা আরম্ভ করল।

তাই এবারে তার নাম হতেই আমরা জোর করে বলে উঠলাম "না, সে কিছুতেই হবে না"। বিশু বলল, "দাশু একটিং করবে? তাহলেই চিত্তির!" ট্যাপা বলল, "তার চাইতে ভজুমালীকে ডেকে আনলেই হয়?" দাশু বেচারা প্রথম খুব মিনতি করল, তারপরেই চটে উঠল,

তারপর কেমন মুষড়ে গিয়ে মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল। যে কয়দিন আমাদের তালিম চলছিল, দাশু রোজ এসে চুপটি করে হলের এক কোণায় বসে বসে আমাদের অভিনয় শুনত। ছুটির কয়েকদিন আগে থেকে দেখি, ফোর্থ ক্লাসের ছোট গণশার সঙ্গে দাশুর ভারি ভাব হয়ে গেছে। গণশা ছেলে মানুষ, কিন্তু সে চমৎকার আবৃত্তি করতে পারে তাই তাকে দেবদূতের পার্ট দেওয়া হয়েছে। দাশু রোজ তাকে নানারকম খাবার এনে খাওয়ায়, রঙ্গিন পেনসিল আর ছবির বই এনে দেয়, আর বলে যে ছুটির দিন তাকে একটা ফুটবল কিনে দেবে। হঠাৎ গণশার উপর দাশুর এতখানি টান হবার কোনও কারণ আমরা বুঝতে পারলাম না। কেবল দেখতে পেলাম, গণশাটা খেলনা আর খাবার পেয়ে ভুলে 'দাশুদা'র একজন পরম ভক্ত হয়ে উঠতে লাগল।

ছুটির দিনে আমরা যখন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, তখন আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল। আড়াইটা বাজতে না বাজতেই দেখা গেল, দাশুভায়া সাজ ঘরে ঢুকে পোষাক পরতে আরম্ভ করেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, "কিরে? তুই এখানে কি করছিস?"

দাশু বলল, "বাঃ, পোষাক পরব না?"

আমি বললাম, "পোষাক পরবি কি করে? তুই ত আর একটিং করবি না।"

দাশু বলল, "বা, খুব ত খবর রাখ? আজকে দেবদূত সাজবে কে জান?"

শুনে হঠাৎ আমাদের মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগল, আমি বললাম, "কেন গণশার কি হল?"

দাশু বলল, "কি হয়েছে তা গণশাকে জিজ্ঞেস করলেই পার?" তখন চেয়ে দেখি সবাই এসেছে, কেবল গণশাই আসেনি। অমনি রামপদ, বিশু, আর আমি ছুটে বেরোলাম গণশার খোঁজে।

সারাটি স্কুল খুঁজে, শেষটায় টিফিন ঘরের পিছনে হতভাগাকে খুঁজে পাওয়া গেল। সে আমাদের দেখেই পালাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমরা চটপট্ গ্রেপ্তার করে টেনে নিয়ে চললাম। গণশা কাঁদতে লাগল, "না, আমি কক্ষণো একটিং করব না, তাহলে দাশুদা আমায় ফুটবল দেবে না।" আমরা তবু তাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় অঙ্কের মাষ্টার হরিবাবু সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি আমাদের দেখেই ভয়ঙ্কর লাল চোখ করে ধমক দিয়ে উঠলেন, "তিন তিনটে ধাড়ি ছেলে মিলে ঐ কচি ছেলেটার পিছনে লেগেছিস? তোদের লজ্জাও করে না?" বলেই আমাকে আর বিশুকে এক একটি চড় মেরে আর রামপদর কাণ মলে দিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেলেন।

এই সুযোগে হাতছাড়া হয়ে, গণেশচন্দ্র আবার চম্পট দিল। আমরাও অপমানটা হজম করে ফিরে এলাম। এসে দেখি দাশুর সঙ্গে রাখালের মহা ঝগড়া লেগে গেছে। রাখাল বলছে, "তোকে আজ কিছুতেই দেবদূত সাজতে দেওয়া হবে না।" দাশু বলছে, "বেশ ত, তাহলে আর কেউ দেবদূত সাজুক আমি রাজা কিম্বা মন্ত্রী সাজি। পাঁচ-ছয়টা পার্ট আমার মুখস্থ হয়ে আছে।" এমন সময় আমরা এসে খবর দিলাম যে, গণশাকে কিছুতেই রাজি করান গেল না। তখন অনেক তর্ক-বিতর্ক আর ঝগড়াঝাটির পর স্থির হল যে, দাশুকে আর ঘাঁটিয়ে দরকার নেই,—তাকে দেবদূত সাজতে দেওয়া হোক। শুনে দাশু খুব খুশি হল আর আমাদের শাসিয়ে রাখল যে, "আবার যদি তোরা কেউ গোলমাল করিস, তা হলে কিন্তু গত বারের মত সব ভণ্ডুল করে দেব।"

তারপর অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম দৃশ্যে দাশু বিশেষ কিছু গোলমাল করেনি, খালি ষ্টেজের সামনে একবার পানের পিক ফেলেছিল। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যে এসে সে একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল। এক জায়গায় তার খালি বলবার কথা—"দেবতা বিমুখ হলে মানুষ কি পারে?" কিন্তু

সে এই কথাটুকুর আগে কোত্থেকে আরও চার পাঁচ লাইন জুড়ে দিল। আমি তাই নিয়ে আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু দাশু বলল, "তোমরা যে লম্বা লম্বা বক্তৃতা কর সে বেলা দোষ হয় না, আমি দুটো কথা বেশি বললেই যত দোষ।"

এও সহ্য করা যেত, কিন্তু শেষ দৃশ্যের সময় তার মোটেই আসবার কথা নয়। তা জেনেও সে ষ্টেজে আসবার জন্য জেদ ধরে বসল। আমরা অনেক কষ্টে অনেক তোয়াজ করে তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, শেষ দৃশ্যে দেবদূত আসতেই পারে না, কারণ তার আগের দৃশ্যেই আছে যে দেবদূত বিদায় নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। শেষ দৃশ্যেও আছে যে মন্ত্রী রাজাকে সংবাদ দিচ্ছেন যে, দেবদূত মহারাজকে আশীর্বাদ করে স্বর্গপুরী প্রস্থান করেছেন। দাশু অগত্যা তার জেদ ছাড়ল বটে, কিন্তু বেশ বোঝা গেল সে মনে মনে একটুও খুশি হয়নি।

শেষ দৃশ্যের অভিনয় আরম্ভ হল। প্রথম খানিকটা অভিনয়ের পর মন্ত্রী এসে সভায় হাজির হলেন। এ কথা সে কথার পর তিনি রাজাকে সংবাদ দিলেন "বার বার মহারাজে আশীষ করিয়া, দেবদূত গেল চলি স্বর্গ অভিমুখে।" বলতেই হঠাৎ কোত্থেকে "আবার সে এসেছে ফিরিয়া" বলে এক গাল হাসতে হাসতে দাশু একেবারে সামনে এসে উপস্থিত! হঠাৎ এ রকম বাধা পেয়ে মন্ত্রী তার বক্তৃতার খেই হারিয়ে ফেলল, আমরাও সকলে কি রকম যেন ঘাবরিয়ে গেলাম—অভিনয় হঠাৎ বন্ধ হবার যোগাড় হয়ে এল। তাই দেখে দাশু খুব সর্দারি করে মন্ত্রীকে বলল, "বলে যাও কি বলিতেছিলে।"

তাতে মন্ত্রী আরও কেমন ঘাবড়িয়ে গেল। রাখাল প্রতিহারী সেজেছিল, সে দাশুকে কি জানি বলবার জন্য যেই একটু এগিয়ে গেছে, অমনি দাশু "চেয়েছিল জোর করে ঠেকাতে আমারে" এই হতভাগা বলে এক চাটি মেরে তার মাথার পাগড়ি ফেলে দিল।

ফেলে দিয়েই সে রাজার শেষ বক্তৃতাটা—"এ রাজ্যেতে নাহি রবে হিংসা অত্যাচার, নাহি রবে দারিদ্র্য যাতনা" ইত্যাদি—নিজেই গড়গড় করে বলে গিয়ে "যাও সবে নিজ নিজ কাজে" বলে অভিনয় শেষ করে দিল। আমরা কি করব বুঝতে না পেরে, সব বোকার মত হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ওদিকে ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল আর ঝুপ করে পর্দা নেমে গেল।

আমরা সব রেগেমেগে লাল হয়ে দাশুকে তেড়ে ধরে বললাম, "হতভাগা ছাথ দেখি সব মাটি করলি, অর্ধেক কথা বলাই হল না।"

দাশু বলল, "বাঃ, তোমরা কেউ কিছু বলছ না দেখেই ত আমি তাড়াতাড়ি যা মনে ছিল সেইগুলো বলে দিলাম। তা না হলে ত আরও সব মাটি হয়ে যেত।"

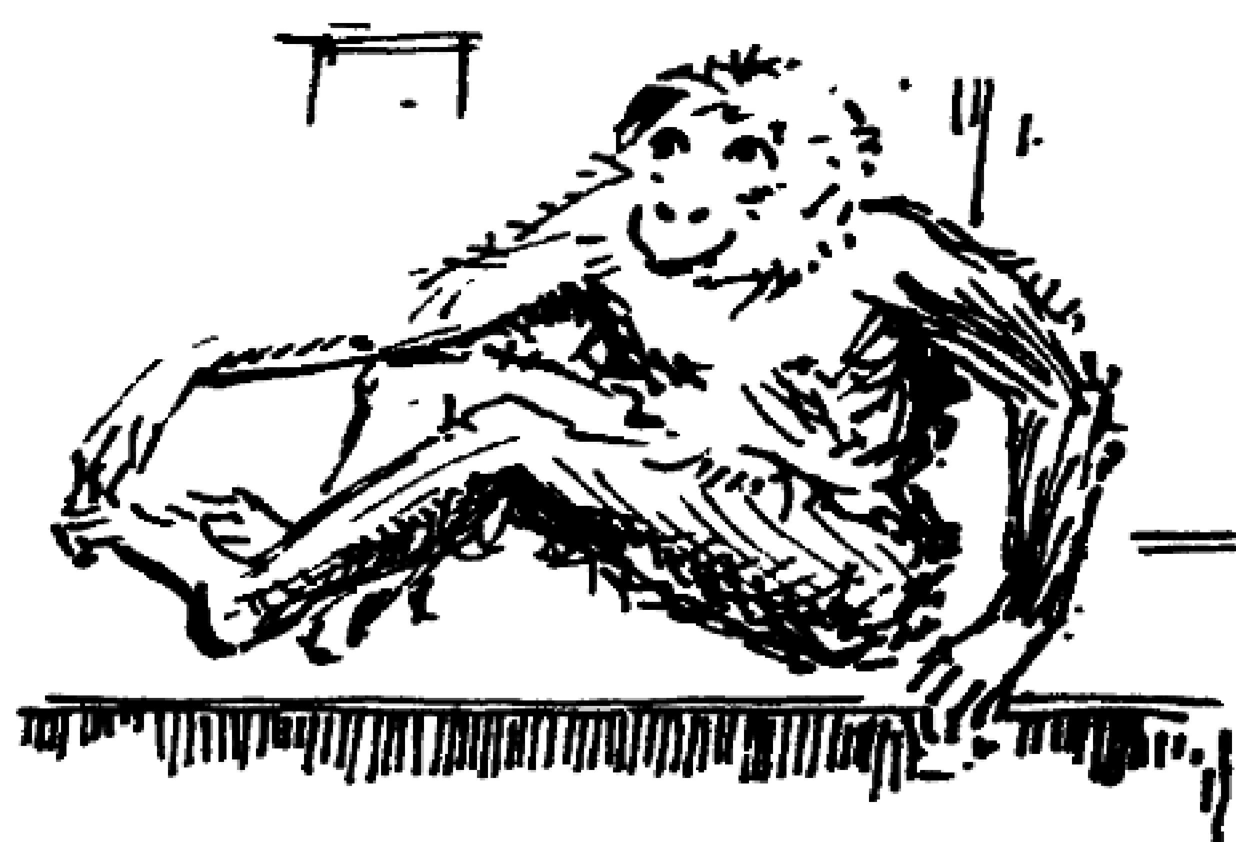
আমি বললাম, "তুই কেন মাঝখানে এসে সব গোল বাধিয়ে দিলি? তাই ত সব ঘুলিয়ে গেল।"

দাশু বলল, "রাখাল কেন বলেছিল যে আমায় জোর করে আটকিয়ে রাখবে? তা ছাড়া তোমরা কেন আমায় গোড়া থেকে নিতে চাচ্ছিলে না আর ঠাট্টা করছিলে? আর রামপদ কেন বার বার আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল?"

রামপদ বলল, "ওকে ধরে ঘা দু'চার লাগিয়ে দে।"

দাশু বলল, "লাগাও না, দেখবে আমি এক্ষুণি চেঁচিয়ে লোক হাজির করি কি না?"

বিশ্বম্ভরবাবুর বিবর্তনবাদ



প্রেমেন্দ্র মিত্র

অতি অল্পের জন্যে বিশ্বম্ভর বাবুর নামটা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে আর লেখা হল না।

হল না, সোনার বা সোনা কেনবার অর্থের অভাবে অবশ্য নয়, কারণ বিশ্বম্ভরবাবু ইচ্ছে করলে গোটা ইতিহাসটাই সোনায় বাঁধিয়ে দিতে পারতেন, সে সঙ্গতি তাঁর আছে। কিন্তু সামান্য একটু গণনার ভুলেই সব মাটি হয়ে গেল।

বিশ্বম্ভরবাবু বৈজ্ঞানিক—তাঁর নিজের এ ধারণা আমরা সকলেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকি ;—আমরা অর্থাৎ যারা তাঁর বৈঠকখানায় নিত্য ধরণা দিই এবং সকালবেলা চা কেক্ বিস্কুট ইত্যাদি সহযোগে এবং বিকালবেলা লুচি মোহনভোগ ইত্যাদি জলযোগ সমভিব্যাহারে তাঁহার বিচিত্র সব বৈজ্ঞানিক গবেষণা গলাধঃকরণ করে থাকি।

বিশ্বম্ভরবাবুর কোন গবেষণা অবশ্য এ-পর্যন্ত বেশি এগোয়নি, কিন্তু তার জন্যে তিনি বিশেষ দুঃখিত নন এবং আমরা তার চেয়েও কম। তিনি প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় আমাদের নানারকম অপরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পরিকল্পনা শোনান। তাতে, আমাদের সামনে যে উপাদেয় আহার্যগুলি ধরে দেওয়া হয়, সেগুলি উদরসাৎ ও হজম করতে আমাদের কোন অসুবিধাই কোনদিন হয় না।

বরং খাবারের চাট্নি হিসাবে বৈজ্ঞানিক নিত্য-নতুন গবেষণা আমাদের ভালই লাগে। গবেষণা যেদিন একটু কঠিন হয়, সেদিন জলযোগটাও আমাদের কিছু গুরুতর হয়ে ওঠে। মাছ ধরবার নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তিনি ব্যাখ্যা করেন, সেদিন চিংড়ি-মাছের কাট্লেট ও ভেট্কি-মাছ ভাজার বহরটাও আমরা বাড়িয়ে নিই। ইঁদুরের দৌরাত্ম্য নিবারণের নতুন পন্থা যেদিন তিনি আবিষ্কার করেন সেদিন—না, সেদিন আমরা মূষিক-জাতির বিলোপে তাঁকে সাহায্য করিনা, তবে

মূষিক যাদের আহার বলে শোনা যায় সেই চীনাদের হোটেল থেকে রসাল কিছু রান্না আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করি।

বিশ্বম্ভরবাবুর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলির অন্য যে ত্রুটিই থাক, সেগুলি যে অনন্যসাধারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইঁদুরের দৌরাত্ম্য নিবারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটাই ধরা যাক্‌না কেন?

সেদিন সন্ধ্যার কথা আমার স্পষ্টই মনে আছে। ছোট ছোট টেবিল সামনে নিয়ে আমরা বিশ্বম্ভরবাবুকে ঘিরে বসেছি তাঁর দরাজ বৈঠকখানায়। তাঁর চাকর আমাদের টেবিলে টেবিলে চিকেন-স্যাণ্ডউইচ আর চা দিয়ে গেছে। অমন চিকেন-স্যাণ্ডউইচ পেটে পড়লে মগজ আপনাথেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। আমাদেরও হবে তাতে আশ্চর্যের কি আছে!

বিশ্বম্ভর তাঁর জন্যে বিশেষভাবে তৈরি চেয়ারে—বুদ্ধি যেমন সূক্ষ্ম বিশ্বম্ভরবাবুর, শরীর সেই পরিমাণে মোটা বলে সাধারণ চেয়ারে তিনি আঁটেন না—একটু নড়ে চড়ে হঠাৎ বল্লেন—আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হল ইঁদুর—

ইঁদুর!—গণেশ তার প্রথম স্যাণ্ডউইচটায় সবে এক কামড় দিয়েছে। সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থায় না গিলতে, না ফেলতে পেরে জড়ানস্বরে কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে,—ইঁদুর কি! এই যে শুনলাম চিকেন-স্যাণ্ডউইচ!

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। কিন্তু গণেশকে তখন থামান শক্ত—ওই জন্যে চীনে-ফিনে হোটেলের নাম করলে আমি চটে যাই। যা কুচিকুচি কেটে চট্‌কে দিয়েছে, কে বুঝবে বলত……

বিশ্বম্ভরবাবু এবার বাধা দিয়ে বল্লেন,—আহা, স্যাণ্ডউইচে ইঁদুরের কথা বলছি না, আমি বলছি আমাদের আলোচনার বিষয় আজ ইঁদুর!

ওঃ, তাই বলুন!—গণেশের গলা দিয়ে স্যাণ্ডউইচ নামল এতক্ষণে।

হ্যাঁ, ইঁদুরের কথাই বলছি, ইঁদুর যে আমাদের কত অনিষ্ট করে তা নিশ্চয় আপনাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। কিন্তু এ-পর্যন্ত দৌরাত্ম্য নিবারণের যত উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে কোনটিই সম্পূর্ণ সফল হয়নি। কেমন করে সফল হবে? বৈজ্ঞানিক মূলনীতি-ই যে তাতে অনুসরণ করা হয়নি। সে-কারণে জাঁতা ও খাঁচাকলে একটা-আধটা ইঁদুর ধরা পড়ে মারা পড়ে বটে, কিন্তু সমগ্র ইঁদুর জাতির প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। তারা বংশানুক্রমে মানুষের শত্রুতা করেই চলে।

বিশ্বম্ভরবাবু একটু থামতেই আমরা চট্ করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে নিলাম। তিনি আমায় বল্লেন—কিন্তু উপায় কি নেই? ইঁদুরের সঙ্গে মানুষের এ বিরোধ কি ঘুচিয়ে দেওয়া যায় না? চোর ডাকাতকে কি করে আমরা জব্দ করি, তাদেব জন্মগত কুপ্রবৃত্তি সংশোধন করে দিই?

গণেশ বলে উঠল—ঠেঙ্গিয়ে!

বিশ্বম্ভরবাবু মাথা নাড়লেন—উঁহু, ঠেঙ্গিয়ে নয়। আধুনিক বিজ্ঞানে তা বারণ। আধুনিক বিজ্ঞান বলে—

আধুনিক বিজ্ঞান কি বলে জানবার আগে আমরা আরেকটা স্যাণ্ডউইচ তাড়াতাড়ি শেষ করে সবল হয়ে নিলাম।

—আধুনিক বিজ্ঞান বলে, চোর ডাকাত বদ্‌মাসকে শাস্তি দিও না। তাদের বদ্‌রোগের গোড়া উপড়ে ফেলে তাদের স্বাভাবিক মানুষ করে তোলো। ইঁদুরদেরও তাই করতে হবে। তাদের বংশে যেন আর মানুষের অনিষ্ট করার বদখেয়াল না দেখা দেয়, তাদের প্রকৃতি যাতে শুধরে যায়!

বিশ্বম্ভরবাবু তারপর সবিস্তারে তাঁর মূষিকোদ্ধার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করছিলেন। স্যাণ্ডউইচের সঙ্গে তার অনেকটাই হজম হয়ে গেছে। যৎসামান্য যা বাকি আছে তা অনেকটা এইরকম—বিশ্বম্ভরবাবু ইঁদুরদের

চরিত্র সংশোধনের জন্য বিরাট একটি যন্ত্র নির্মাণ করতে চান। সে যন্ত্রটি হবে বিশাল একটি গোলকধাঁধা-খাঁচা-বিশেষ। যেদিক দিয়ে ঢুকবে সেদিক দিয়ে ইঁদুর বেচারার আর বেরুবার উপায় থাকবে না। ক্রমাগত আঁকা-বাঁকা ঘোরানো পথে তাকে ঘুরে চলতে হবে সামনের দিকে। আর সেই পথের বাঁকে বাঁকে থাকবে তার শিক্ষার ব্যবস্থা। যেমন প্রথম খানিকটা এগিয়ে যাবার পরই দেখা যাবে উপাদেয় এক-টুকরো রুটি। ইঁদুরের সাধ্য কি সে লোভ সামলায়, কিন্তু লোভে পড়ে কামড় দিতে গেলেই মুস্কিল। সামনের আয়নায় তৎক্ষণাৎ এক মস্ত হুলো বেড়ালের ছবি ভেসে উঠবে। ইঁদুরকে তৎক্ষণাৎ দৌড় দিতে হবে ভয়ে। অনেকদূর দৌড়ে গিয়ে সে হাঁপিয়ে উঠবে, ক্ষিদেও তার পাবে নিশ্চয়। তখন সামনে দেখা যাবে ভালো একটি বাঁধানো বই কি সিল্কের কাপড়—যা কেটে কুটি কুটি করবার জন্যে ইঁদুরের দাঁত নিশপিশ করে উঠবে। কিন্তু দাঁত চালিয়েছে কি লুকোনো গ্রামোফোন থেকে মার্জার-সঙ্গীত বেজে উঠবে—ম্যাঁ-ও-ও! আবার ছুট্, ছাড়া গতি নেই। ছুটতে ছুটতে ইঁদুরের পা ছিঁড়ে যাবার জোগাড়। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ! তখন দেখা যাবে পথের একধারে কাটা-ঘাস আরেকধারে খোলা কৌটোয় আমসত্ত্ব কি ডালের বড়ি। ইঁদুর প্রথমে ঘাস খাবেনা, আমসত্ত্ব কি বড়ির দিকেই তার টান। কিন্তু কৌটোর দিকে মুখ বাড়াতেই গলায় লেগে যাবে ফাঁস। একেবারে আধমরা হবার পর সে ফাঁস খুলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে আবার বেড়াল কুকুরের ডাক। আবার তাকে পালাতে হবে। তারপর অনেক নাকানি-চোবানির পর তাকে নানাভাবে ঘাসের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে, অবশেষে পেটের জ্বালায় ঘাস খাইয়ে খাঁচা থেকে বার করে দেওয়া হবে। বিশ্বম্ভরবাবুর মতে এ-খাঁচা থেকে সে একেবারে সাত্ত্বিক ইঁদুর হয়ে বেরুবে। তার দৃষ্টান্ত ও উপদেশে হাজার ইঁদুরের জীবনের গতি

বদলে যাবে। ঘাস যে কত প্রচুর, ঘাস খাওয়া যে কত নিরাপদ তা বুঝে তারা মানুষের অনিষ্ট-করা একদম ছেড়ে দেবে। গোলকধাঁধা যন্ত্র থেকে দলে দলে এইরকম প্রচারক ইঁদুর বার করে পৃথিবীর মূষিকজাতিকে চিরদিনের মত উদ্ধার করাই বিশ্বম্ভরবাবুর উদ্দেশ্য।

বিশ্বম্ভরবাবুর এইসব সাধু বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য যতদিন মৌখিক ব্যাখ্যার বেশি এগোয়নি ততদিন বেশ চলেছিল। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে রসনার সদ্ব্যবহার করে তাঁকে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করিনি।

কিন্তু হঠাৎ ত্র্যহস্পর্শ ঘটে আমাদের এমন বৈঠক ভেঙে গেল। সেই দুঃখের কাহিনী-ই বলি।

ত্র্যহস্পর্শ-যোগটি এইরকম—বিশ্বম্ভরবাবু কিছুদিন থেকে ডারুইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। কোথা থেকে কি ভাবে আমরা মানুষ হয়েছি সকাল বিকাল তাই বোঝানই হয়েছিল তাঁর কাজ।

ছেলেবেলা পাকা কুল ও ডাঁসা পেয়ারার লোভে গাছে আর কে না উঠেছে! কিন্তু তাই বলে মানুষ জাতটাই তাদের ছেলেবেলায় গাছ থেকে নেমে এসেছে, এ মতটা আমাদের তেমন মনঃপূত হচ্ছিল না। এমন কি, সকাল বিকালের জলযোগের ঘটা বাড়িয়েও আমাদের অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পেরে বিশ্বম্ভরবাবু একদিন একটি জ্যান্ত গেছো বাঁদর আমদানি করে বসলেন। বৈঠকখানার বাইরের বারান্দায় শেকল দিয়ে সেটাকে বেঁধে রাখা হল আমাদের শিক্ষার সুবিধার জন্যে।

বাঁদরের সঙ্গে আমাদের গাছতুত-জ্ঞাতিত্বের সম্পর্ক যখন আমরা বিশ্বম্ভরবাবুর বক্তৃতার ভয়ে প্রায় মেনে নিয়েছি, তখন হঠাৎ কোথা থেকে আমাদের পাড়ায় এক প্রাণান্তকর চুলকোণার আবির্ভাব হল। সে চুলকোণা আমাদের সকলকে চঞ্চল করে ত তুললই, বিশ্বম্ভরবাবুর বৈজ্ঞানিক-বপুকেও বাদ দিলেনা। বিবর্তন-বাদ, বাঁদর ও চুলকোণা

এই ত্র্যহস্পর্শ-যোগ থেকেই বিশ্বম্ভরবাবুর নতুন গবেষণার সূত্রপাত এবং আমাদের বৈঠকের অপঘাত।

বিশ্বম্ভরবাবু সেদিন দুপুরবেলা বৈঠকখানায় বসে বিবর্তন-বাদের একটা মোটা বই আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে হস্তচালনাও চলছে চুলকোণার তাড়নায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুলকোণারই জয় হল। হবারই কথা। যুগপৎ হাত ও মাথা ত চালান যায় না! বিশেষ করে যখন মনে হয় যে, চুলকোণা যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের পক্ষে মাত্র দুটি হাত মানুষকে দেওয়া অত্যন্ত অবিচার হয়েছে। রাবণের মত বাহুর বাহুল্য যাদের আছে, চুলকোণা একমাত্র তাদেরই অঙ্গে শোভা পায় ও সুখ দেয়।

শুধু হাতে সুবিধে করতে না পেরে বিশ্বম্ভরবাবু পাখার বাঁট প্রয়োগ করতে বাধ্য হন এবং তারপর পাগলের মত বেরিয়ে আসেন বারান্দায়। বিবর্তনবাদের বই অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে।

বারান্দায় কিন্তু যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ে তাতে খানিক-ক্ষণের জন্যে চুলকোণার জ্বালাও বুঝি তিনি ভুলে যান। তাঁর এমন ভুক্তভোগী সমব্যথী যে সেখানে আছে তাও তিনি এতদিন লক্ষ্য করেন নি! গাছতুত-জ্ঞাতিত্বের নতুন পরিচয় লাভ করে তিনি চমৎকৃত হয়ে যান। তিনি ও তাঁর বাঁদর, দুজনেরই এক জ্বালা; বাঁদরের চুলকোণা 'ক্রণিক' এবং তাঁর ক্ষণিক এই মাত্র তফাৎ।

খানিকক্ষণ উভয়ের চুলকোণার পাল্লা চলে, তারপর হঠাৎ এক আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক-সত্য বিশ্বম্ভরবাবুর মনে প্রতিভাত হয়, নিউটনের মনে যেমন হয়েছিল গাছ থেকে আপেল পড়তে দেখে।

চুলকোণা! চুলকোণা! চুলকোণাতেই সমস্ত রহস্যের মীমাংসা, চুলকোণাতেই বিবর্তনের সূত্রপাত,—চুলকোণাই বৈজ্ঞানিক-ধাঁধার উত্তর—মিসিংলিঙ্ক।

সেদিনকার সান্ধ্য-বৈঠকেই—পাখা নয় পাখার বাঁট চালাতে চালাতে বিশ্বম্ভরবাবু তাঁর নতুন 'থিওরি'র পত্তন করেন।

বাঁদর! বিবর্তন-বাদের মূর্তিমান এই যে প্রমাণ, একে আপনারা লক্ষ্য করেছেন ভালো করে? কেউ করেছে এ পর্যন্ত! বলুন দেখি কি তার বিশেষত্ব, কি সে করে?

গণেশ বলে,—কি আর করে, বাঁদরামি!

বিশ্বম্ভরবাবু অধৈর্য হয়ে ওঠেন—না, না, হল না।

আমরা সবাই নানারকম পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় দিই। কেউ বলে,—বাঁদর গাছে গাছে লাফায়, কেউ বলে,—মুখ ভ্যাংচায়, কেউ বলে,—কিচির-মিচির করে, কিন্তু বিশ্বম্ভরবাবু সকলের ভুল সংশোধন করে বলেন,—না; বাঁদর গা চুলকোয়, সারাদিন-রাতই চুলকোয়। তার চুলকোণা কোন জন্মে সারেনা।

আমরা এই অভাবিত আবিষ্কারে বিমূঢ় হয়ে বসে থাকি, বিশ্বম্ভর-বাবু তাঁর 'থিওরি' আরও সরলভাবে বুঝিয়ে দেন। বাঁদরের সঙ্গে আমাদের এই যে প্রভেদ সে কেবল চুলকোণার দরুণ। চুলকোণা যে কি বস্তু তা আমরা সকলেই জানি। চুলকোণার সময় মানুষের আর জ্ঞান থাকে না। কোন বিষয়ে মনোযোগ দেবার ক্ষমতা থাকেনা। বুদ্ধি থেকেও তা কাজে লাগে না। বাঁদরদের হয়েছে তাই। বুদ্ধি তাদের আছে, কিন্তু চুলকোণায় তারা এমন ব্যতিব্যস্ত যে সে-বুদ্ধি খাটাতে পারেনা। স্থির হয়ে একদণ্ড বসতে না পারলে বুদ্ধি ব্যবহার করবে কি করে! মানুষ যে বাঁদরদের চেয়ে উন্নতি করেছে সে কেবল তার চুলকোণা এমন দুরারোগ্য নয় বলে। আজ-বাদে-কাল বৈজ্ঞানিকদেরও তিনি স্বীকার করিয়ে ছাড়বেন যে, প্রথম যে বাঁদরের সেরে গেছল তার থেকেই মানুষের সভ্যতা সুরু। চুলকোণা সারিয়ে তাদের সভ্য করে তোলা যায়।

বিশ্বম্ভরবাবুর প্রস্তাবের কোনো প্রতিবাদ হয়না।

সমারোহসহকারে তার পরদিনই বাঁদরের চর্মরোগ সারাবার আয়োজন সুরু হয়। ডাক্তারখানা থেকে দামি দামি মলম আসে, কার্বলিক সাবান বাক্স বাক্স খরচ হয়ে যায়।

কিন্তু ফল তেমন সুবিধের হয়না। দেখা যায়, চুলকোণা সারবার আগেই বাঁদর বেচারার পেটের রোগ সুরু হয়ে গেছে। সে নাকি তার গায়ের মলম চেটেই সাবাড় করে দেয়।

অ্যালোপ্যাথির বদলে কবিরাজী এবং তারপর হোমিওপ্যাথির ব্যবস্থা যখন হয় তখন বাঁদরের অবস্থার বেশ একটু পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। লম্ফ ঝম্প ছেড়ে সে কাৎ হয়ে শুয়ে-ই থাকে দিন রাত।

গণেশ সংশয়ের সুরে বলে—বেচারা বোধহয় চিকিৎসার চোটে টেঁসেই গেল!

বিশ্বম্ভরবাবু চটে ওঠেন রীতিমত—চিকিৎসার দোষটা কি?

গণেশ বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলে—চিকিৎসাটাই হয়তো দোষ। চুলকোণাটাই হল ওর বাঁদরামি। সেটাই যদি সেরে গেল তবে ও বাঁচবে কিসের জন্যে?

তুমি ছাই বোঝ—বিশ্বম্ভরবাবু বিরক্ত হয়ে ওঠেন,—এই শান্তশিষ্ট হওয়া, এটাই হোলো উন্নতির লক্ষণ। ওর বাঁদরামি কেটে যাচ্ছে!

কিন্তু বাঁদরামি কেটে গেলেও সভ্য হবার কোন আগ্রহ তার ভেতর দেখা যায় না।

বিশ্বম্ভরবাবু নানারকম বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-পদ্ধতি পরীক্ষা করেন। বাঁদরটা কাৎ হয়ে শুয়েই থাকে, কেবল মাঝে মাঝে দন্তবিকাশ করে—সেটা হাসির না দুঃখের বোঝা যায়না ঠিক।

অবশেষে গণেশের মাথা থেকেই বুদ্ধি বেরোয় একদিন। ব্যাপারটা সেই তলিয়ে বোঝে।

ও কিছুতেই কিছু শিখবেনা।—সে মন্তব্য করে।

কেন?—বিশ্বম্ভরবাবু জিজ্ঞাসা করেন অবাক হয়ে।

অত লজ্জা থাকলে কেউ কিছু শেখে—গণেশ গম্ভীরভাবে বলে।

লজ্জা আবার কিসের!—আমরা সবাই অবাক হয়ে প্রশ্ন করি।

লজ্জা ওর ল্যাজের।

ঠিক কথাইত! ল্যাজই হল বানরের বা, ওটা বাদ দিলেই আর তফাৎ নেই। বিশ্বম্ভরবাবু উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। স্থির হয়, অবিলম্বে লাঙ্গুলের কলঙ্ক থেকে তাকে মুক্ত করা হবে এবং লাঙ্গুল মোচন করবেন স্বয়ং বিশ্বম্ভরবাবু। বাঁদর যেন তাঁরই কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে।

কিন্তু হায়, লাঙ্গুল থেকে এত বিপত্তি হবে কে জানত! কিম্বা রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের কথা স্মরণ থাকলে কে না জানত! আয়োজনের কোন ক্রুটিই হয়নি। ছুরি, কাঁচি, তুলো, তোয়ালে, আয়োডিন ইত্যাদি সবই মজুত। ক দিন থেকে বাঁদর বেচারা যে রকম শান্ত শিষ্টের মত কাৎ হয়ে কাটাচ্ছিল তাতে মনে হয়েছিল কৃতজ্ঞ-চিত্তেই সে নিজের কলঙ্ক-মোচনে সায় দেবে, বিশেষ করে কড়া ক্লোরোফর্ম সেবনের পর।

তার বদলে হতভাগা ল্যাজে হাত দিতেই লাফ দিয়ে উঠে এমন কামড় দিলে—আর দিলে কিনা স্বয়ং বিশ্বম্ভরবাবুকে!

হুলুস্থুল কাণ্ড বেঁধে গেল তৎক্ষণাৎ। বাঁদরের বদলে তুলো, তোয়ালে, আয়োডিন বিশ্বম্ভরবাবুর কাজেই লেগে গেল। ঘা ধুইয়ে বেঁধে আমরা তাঁকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলাম আর অকৃতজ্ঞ বাঁদরটাকে শেকল খুলে রাস্তায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের সেইখানেই শেষ নয়। পরের দিন খবর নিতে গিয়ে দেখি, বিশ্বম্ভরবাবু বেশ বদলে গেছেন। বৈজ্ঞানিক-গবেষণায় আর যেন তাঁর গা নেই। কোথায় গেল চা আর-জলখাবার! অনেকক্ষণ বসে থেকে তার কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। একটা বাঁদর নেমকহারাম

হলেও সব বাঁদর তেমন নয় বলে, আরেকটা বাঁদর আনিয়ে পরীক্ষা করার প্রস্তাবে তিনি যেন চটেই গেলেন। গণেশটা সহানুভূতি জানাতে গিয়ে আরো গোল বাঁধালে।

কিন্তু খুব সাবধান বিশ্বম্ভরবাবু। বাঁদরের দাঁতে বড় বিষ। বেশ কিছু গোলমাল হতে পারে।

বিশ্বম্ভরবাবু ভীত হয়ে উঠলেন,—তাই নাকি! কি হয় বলুন ত?

কি না হতে পারে!—গণেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল এ প্রসঙ্গে। তার এক মাসতুত ভাই ডাক্তার কিনা—সেপ্‌টিসিমিয়া, হাইড্রোফোবিয়া!

হাইড্রোফোবিয়া!—বিশ্বম্ভরবাবু একটু বিমূঢ়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাকে বলে জলাতঙ্ক।

জলাতঙ্ক হবে কেন?—বিশ্বম্ভরবাবু বিরক্ত।—জলাতঙ্ক ত কুকুর কামড়ালে হয়। আমায় ত বাঁদরে কামড়েছে।

ও কুকুর আর বাঁদর একই কথা। মোটমাট একটা আতঙ্ক কিছু হবেই—গণেশ তাঁকে আশ্বাসের সুরে বল্লে,—জলাতঙ্ক না হয় স্থলাতঙ্ক!

স্থলাতঙ্ক আবার কি!—বিশ্বম্ভরবাবু বিহ্বল।

ওই জলাতঙ্কেরই ভায়রা-ভাই। কুকুর জল পছন্দ করেনা তাই কুকুর কামড়ালে হয় জলাতঙ্ক, আর বাদর গাছে থাকে তাই বাদরে কামড়ালে —স্থলাতঙ্ক।

তাহলে উপায়?—বিশ্বম্ভরবাবু শঙ্কিত।

উপায় বলতে গেলে নেই!—গণেশের স্বর সান্ত্বনায় স্নিগ্ধ—জলাতঙ্কের ইঞ্জেক্‌শন বেরিয়েছে, কিন্তু স্থলাতঙ্কের ওষুধ ত নেই।

ওষুধ নেই!—বিশ্বম্ভরবাবু প্রায় মূর্ছিত।

তবে এক কাজ করতে পারেন। স্থল পরিত্যাগ করতে পারেন একেবারে! স্থলে না থাকলে ত আর স্থলের আতঙ্ক হতে পারবেনা।—গণেশ নিজের অন্তপ্রেরণায় উল্লসিত হয়ে উঠল।

কিন্তু কোথায় থাকব তাহলে ?—বিশ্বম্ভরবাবু চিন্তিত।

কোথায় আবার,—জলে !—গণেশ সোৎসাহে জানালে। খানিক অন্যমনস্কভাবে চুপ ক'রে থেকে বিশ্বম্ভরবাবু বল্লেন,—আচ্ছা, ভেবে দেখি। আপনারা আজ তা হলে আসুন।

চা ও জলখাবার তখনও এসে না পড়ায় আমরা আরো খানিকক্ষণ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এরকম স্পষ্ট জবাবের পর বসে থাকা যায় কি ?

•

তারপর আর কিছুই লেখবার নেই। বিশ্বম্ভরবাবু, আহাম্মক গণেশটার কথা ওভাবে গ্রহণ করবেন কে ভেবেছিল। সেই থেকে স্থলাতঙ্কের ভয়ে তিনি জাহাজে জাহাজে পৃথিবী 'টুর' করে বেড়াচ্ছেন। জাহাজ থেকে ডাঙ্গায় পর্যন্ত নামেন না। বিবর্তন-বাদ সম্বন্ধে তাঁর যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক-গবেষণা আর শেষ হয়নি। আমাদের বৈঠকও ভেঙ্গে গেছে।

জোড়া-ভরতের জীবন-কাহিনী



শিবরাম চক্রবর্ত্তী

বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। গত শতাব্দীর শেষের দিকে তখনও তোমরা আসনি পৃথিবীতে। আমিও আসব কি না তখনও আন্দাজ করে উঠতে পারছিলাম না,' সেই সময়ে বারাসতে এই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছিল। অবশ্য তারপর আমিও এসেছি, তোমরাও এসেছ। আসার কিছুদিন পরেই দিদিমার কাছে গল্পটা শুনি। তোমাদের দিদিমা নিশ্চয়ই বারাসতের নন, কাজেই তোমাদের শোনাবার ভার আমাকেই নিতে হল।

সেই সময়ে একদা সুপ্রভাতে বারাসতের রামলক্ষ্মণ ওঝার বাড়ি যমজ ছেলে জন্মালো। যমজ কিন্তু আলাদা নয়, পেটের কাছটায় মাংসের যোজক দিয়ে আশ্চর্য রকমে জোড়া। এই অদ্ভুত লক্ষণ রামলক্ষ্মণ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "আমার বরাত জোর বলতে হবে। লোক একেবারে একটা ছেলেই পায় না, আমি পেলাম দু-দুটো—একসঙ্গে এবং একাধারে!"

ডাক্তার এসে বলেছিল, "কেটে আলাদা করবার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু তাতে বাঁচবে কিনা বলা যায় না।"

রামলক্ষ্মণ বল্লেন—উঁহুহু। যেমন আছে তাই ভালো। ভগবান দিয়েছেন, কপালের জোরে ওরা বেঁচে থাক্‌বে।

ছেলেদের নাম দিলেন তিনি, রামভরত ও শ্যামভরত।

পৌরাণিক যুগে জড়ভরত ছিল, তার বহুকাল পরে, কলিযুগে এই বিস্ময়কর আবির্ভাব—জোড়াভরত।

জোড়াভরত প্রতিদিনই জোরালো হয়ে উঠ্‌তে লাগল। ক্রমশঃ হামাগুড়ি দিতেও সুরু করল। চার হাতে চার পায়ে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! কে একজন নাকি মুখ বেঁকিয়েছিল—"ছেলে না তো চতুষ্পদ!" রামলক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করেছেন—"চতুর্ভুজও বলতে পারো। সাক্ষাৎ ভগবান! সকালে উঠেই মুখ দেখি, মন্দ কি!" তারপর পুনশ্চ জোর দিয়েছেন—"হ্যাঁ, নেহাৎ মন্দ কি?"

ক্রমশঃ তারা বড় হল। ভায়ে ভায়ে এমন মিল কদাচই দেখা যায়। পরস্পরের প্রতি প্রাণের টান তাদের এত প্রবল ছিল যে কেউ কাউকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারত না। তাদের এই অন্তরঙ্গতা যে কেউ লক্ষ্য করেছে সেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে এদের ঘনিষ্ঠতা বরাবর থাকবে, এদের ভালোবাসা চিরদিনের। সকলেই বলেছে যে ভাই ভাই ঠাই ঠাই একটা প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু যেরকম ভাবগতিক দেখা যাচ্ছে তাতে এদের দুভায়ের মধ্যে কখনও ছাড়াছাড়ি হবে দুঃস্বপ্নেও এমন আশঙ্কা করা যায় না। এদের আত্মীয়তা কোনদিন যাবার নয়, নাঃ। বাংলা দেশে আদর্শ ভ্রাতৃত্বের জন্যে মেডেল দেবার ব্যবস্থা—সে সময়ে থাকলে সে-মেডেল যে ওদেরই কুক্ষিগত হত এ কথা অকুতোভয়ে বলা যায়।

দুভায়ে একসঙ্গেই খেলা করত, একসঙ্গে বেড়াত, একসঙ্গে খেত, আঁচাত এবং ঘুমাত। অন্য সব লোকের সঙ্গ তারা একেবারেই পছন্দ করত না। সব সময়েই তারা কাছাকাছি থাকত, একজনকে ছেড়ে আরেকজন খুব বেশি দূরে যেত না। রামলক্ষ্মণের গিন্নী তাদের এই সুগুণের কথা জানতেন, এই কারণে যদি বা কখনও ছেলেরা হারিয়ে যেত, স্বভাবতঃ তিনি একজনেরই খোঁজ করতেন—তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল যে একজনকে যদি খুঁজে পান তাহলে আরেকজনকে তার অতি সন্নিকটেই পাবেন। এবং দেখা গেছে তাঁর ভুল হত না।

আরও বড় হলে রামলক্ষ্মণ ওদের ওপর গরু দুইবার ভার দিলেন। রামলক্ষ্মণের খাটাল ছিল। সেই খাটালে গরুরা বসবাস করত, তাদের দুধ বেচে ওঝা মহাশয়ের জীবিকানির্বাহ হত। রামভরত গরু দুইত, শ্যামভরত তার পাশে দাঁড়িয়ে বাছুর সামলাত—কিন্তু সব দিন সুবিধা হয়ে উঠত না। এক একদিন দুরন্ত বাছুরটা অকারণ পুলকে লাফাতে সুরু করত, শ্যামভরতকেও তার সঙ্গে লাফাতে হত, তখন রামভরতের না

লাফিয়ে পরিত্রাণ ছিল না। রামভরতের হাতে দুধের বালতিও লাফাতে ছাড়ত না, এবং দুধের অধঃপতন দেখে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে রামলক্ষ্মণ স্বয়ং লাফাতেন।

এত লাফালাফি সহ্য করতে না পেরে রামলক্ষ্মণের গিন্নী একদিন বলেই ফেল্লেন—"দুধের বাছা ওরা কি দুধ দুইতে পারে?"

রামলক্ষ্মণ বিরক্তি প্রকাশ করেছেন--"নাঃ, কিছু হবে না ওদের দিয়ে। ইস্কুলেই দেব ওদের, হ্যাঁ।"

ইস্কুলের নামে দুভায়ের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

একদিন ত বাছুরটা শ্যামভরতকে টেনে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল। রামভরতকেও তখন দুধ দোয়া স্থগিত রেখে, অগত্যা, বাছুর এবং ভাইয়ের সঙ্গে দৌড়তে হল।

রামলক্ষ্মণ সেদিন স্পষ্টই বলে দিলেন—"না, তোরা আর মানুষ হবি না। যা, তবে ইস্কুলেই যা তাহলে।"

ইস্কুলে গিয়ে দুভায়ের অবস্থা আরও সঙ্গীন হল। একসঙ্গে ইস্কুলে যায় ইস্কুল থেকে আসে, কিন্তু সে কথা বলছি না। মুস্কিল হল এই, এক ভাই লেট করলে আরেক ভায়ের লেট হয়ে যায়, সেই অপরাধের সাজা দিতে এক ভাইকে কনফাইন করলে আরেক ভাই তাকে ফেলে বাড়ি চলে আসতে পারে না, তাকেও আটক থাকত হয়, বিনা দোষেই। একজন যদি পড়া না পারে এবং তাকে মাষ্টার মশাই বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দ্যান, তখন অন্য ভাইকে, নিখুঁত ভাবে পড়া দেওয়া সত্বেও, সেই সঙ্গে বেঞ্চে দাঁড়াতে হয়! সব চেয়ে হাঙ্গাম বাধল সেইদিন যেদিন দুজনের কেউই পড়া পারল না। মাষ্টার বল্লেন একজনকে বেঞ্চে দাঁড়াতে, আরেকজনকে মেজেতে নিল্‌ডাউন হতে। মাষ্টারের হুকুম পালন করতে দুজনেই প্রাণপণ চেষ্টা করল খানিকক্ষণ, কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব "ধুত্তোর" বলে সেই যে ইস্কুল তারা ছাড়ল—ওমুখোই হল না আর।

বাড়িতে বাবাকে এসে বলল, "মানুষ হবার ত আশা ছিলই না, তুমিই বলে দিয়েছ! অমানুষ হবার চেষ্টা করলাম তাও পারা গেল না!"

শ্যামভরতও ভাইয়ের কথায় সায় দিয়েছে—"অমানুষিক কাণ্ড আমাদের দ্বারা হবার নয়। নিলডাউন আর বেঞ্চে দাঁড়ান। দুটো একসঙ্গে আবার!"

তারপর থেকে রামলক্ষ্মণ ছেলেদের আশা একেবারেই ছেড়েছেন।

যখন ওরা যুবক হয়ে উঠল তখন ওদের মধ্যে এক আধটু গরমিলের সূত্রপাত দেখা গেল। রামভরত ভোরের দিকটায় ঘুমাতেই ভালোবাসে। তার মতে সকালবেলার ঘুমটাই হচ্ছে সবচেয়ে উপাদেয়। কিন্তু শ্যামভরতের সেই সময়ে প্রাতঃভ্রমণ না করলেই নয়। ভোরের হাওয়ায় নাকি গায়ের জোর বাড়ে। বাধ্য হয়ে আধ ঘুমন্ত রামভরতকে ভায়ের সঙ্গে উঠে বেরুতে হয়।

মাইল পাঁচেক হেঁটে হাওয়া খেয়ে শ্যাভরত ফেরে, ক্লান্ত রামভরত তখন শুতে পারলে বাঁচে। ঘুমাতে ঘুমাতে ভাইয়ের সঙ্গে বেরিয়েছে সেই কখন, আর দৌড়তে দৌড়তে ফিরল এই এখন—এ রকম অবস্থায় কার না গা জড়িয়ে আসে, কে না গড়াতে চায়? কিন্তু শ্যামভরত তখন-তখনই আদা ছোলা চিবিয়ে ডনবৈঠক করতে লাগবে—কাজেই রামভরতের আর গড়ান হয় না, তাকেও ভাইয়ের সঙ্গে ওঠবোস করতে হয়।

ব্যায়াম সেরেই শ্যামভরত স্নান সারবে, রামভরত বিছানার দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করে তেল মাখতে বসে—কি করবে? স্নান সেরেই শ্যামভরতের রুটির থালার সামনে বসা চাই—সমস্ত রুটিন বাঁধা। ব্যায়াম করেছে, ভোরে হেঁটেছে—তার চোঁ চোঁ ক্ষিদে। বেচারা রামভরতের রাত্রে ঘুম হয়নি, ভোরেও তাকে জাগতে হয়েছে, দারুণ

হাঁটাহাঁটি, তারপর ফিরে এসেই ভাইয়ের সঙ্গে ওঠবোস করার পরিশ্রম। জিরবার এক মুহূর্ত পায়নি—গরহজম হয়ে এখন তার ঢোঁয়া ঢেকুর উঠছে।

সে বলেছে—"এখন ক্ষিদে নেই, পরে খাব।"

ভাই ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে—"পরে আবার খাবি কখন? পরে আমার আবার কখন সময় হবে? আমার কি আর অন্য কাজ নেই?"

সে জবাব দিয়েছে—"আমার ক্ষিদে নেই এখন।"

শ্যামভরত চটে গেছে—"ক্ষিদে নেই, কেবল ক্ষিদে নেই! কেন যে ক্ষিদে হয় না আমি ত বুঝি না। কেন তুমিও ত সকালে উঠে বেরিয়েছ, আমি ত আর একা যাই নি। তুমিও ত ব্যায়াম করেছ বাপু! তবে? ক্ষিদেয় আমি মরে যাচ্ছি, আর তোমার ক্ষিদে নেই নেই—এ কেমন কথা?"

কাজেই রামভরতকে গরহজমের উপরই আবার গলধঃকরণ করতে হয়েছে।

খাওয়া দাওয়া সেরে, প্রথম সুযোগেই, রামভরত ভাইকে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। "এবার একটু শুলে হয় না?

"শোয়া আর শোয়া! দিনরাত কেবল শোয়া! কি বিছানাই চিনেছ বাবা!" শ্যামভরত গম্ভীর ভাবে ছিপ হাতে নেয়।

"এই দুপুরে রোদে দারুণ গরমে তুমি মাছ ধরতে যাবে?" রামভরত ভীত হয়ে ওঠে!

"যাবই ত!" শ্যামভরত বলে, "কেবল শুয়ে শুয়ে হাড় ঝরঝরে হবার যোগাড় হল! তোমার ইচ্ছে হয় তুমি পড়ে পড়ে ঘুমাও, আমি মাছ ধরতে চল্লুম!"

শ্যামভরতের গায়ের জোর বেশি, টানও প্রবল। কাজেই কিছু পরে

দেখা যায়, শ্যামভরত মাছ ধরছে আর রামভরতকে তার কাছে চুপটি করে বসে থাকতে হয়েছে !

বেলা গড়িয়ে আসে, এক ভাই মাছ ধরে, আরেক ভাই পাশে বসে ঢুলতে থাকে।

এই ভাবে দুভাই ক্রমশ আরও বড় হয়ে ওঠে।

একদা বাপ রামলক্ষ্মণ বল্লেন—"বড় হয়েছিস, এবার একটা কাজকর্মের চেষ্টা দ্যাখ। বসে বসে খাওয়াটা কি ভাল ?

বসে বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে কিম্বা দৌড়তে দৌড়তে কি ভাবে খাওয়াটা সবচেয়ে ভাল সে সম্বন্ধে জোড়াভরত কোনদিন ভাবেনি, কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও, বাপের কথা মেনে নিয়েই চাকরির খোঁজে তারা বেরিয়ে পড়ল।

গাঁট্টা চেহারা দেখে একজন ভদ্রলোক শ্যামভরতকে দারোয়ানির কাজে বহাল করলেন, কিন্তু রামভরতকে কাজ দিতে তিনি নারাজ। শ্যামভরত দিনরাত পাহারা দেয়, রামভরতও ভাইয়ের সঙ্গে গেটে বসে থাকে।

ভদ্রলোক শ্যামভরতের খোরাকি দেন, রামভরতকে কেন দেবেন ? রামভরত ত তাঁর কোন কাজ করে না। সে যে গায়ে পড়ে, উপরন্তু তাঁর বাড়ি পাহারা দিয়ে দারোয়ানির কাজে বিনে পয়সায় অমনি পোক্ত হয়ে যাচ্ছে তার জন্য যে তিনি কিছু চার্জ করেন না এই যথেষ্ট।

তিন দিন না খেয়ে থেকে রামভরত মরীয়া হয়ে উঠল, বল্লে, "আমি তা হলে গাড়োয়ানিই করব।"

এই না বলে একজন গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে, কেবল খাওয়া পরার চুক্তিতে এপ্রেনটিস্ নিযুক্ত হয়ে গেল।

এর পর রামভরত গাড়োয়ানি করতে যায়, শ্যামভরতকেও ভাইয়ের সঙ্গে যেতে হয়। উন্মুক্ত সদর দ্বার বিনা রক্ষণাবেক্ষণে পড়ে থাকে।

কোনদিন বা শ্যামভরত দরজা কামড়ে পড়ে, সেদিন আর রামভরতের গাড়োয়ানিতে যাওয়া হয় না।

অবশেষে একদিন এক কাণ্ড হয়ে গেল। ক্ষুধাতুর রামভরত থাকতে না পেরে বাবুর বাগানের এক কাঁদি মর্তমান কলা চুরি করে বসিয়ে দিল। শ্যামভরত ভাইকে বারণ করেছিল কিন্তু ফল হয় নি। তখন থেকে শ্যামভরতের মনে বিবেকের দংশন সুরু হয়ে গেছে।

কর্তা তাকে পাহারা দেবার কাজে বহাল করেছেন। চুরি-চামারি যাতে না হয় তাই দেখাই তার কর্তব্য। কিন্তু এ চুরি যে কেবল তার চোখের সামনেই হয়েছে তা নয়, সে তাতে বাধা দেয়নি, দিতে পারেনি, এমন কি একরকম প্রশ্রয়ই দিয়েছে বলতে গেলে। তার কি এতে কর্তব্যের ত্রুটি হয়নি, এ কি বিশ্বাসঘাতকতা নয়? কে বড়? ভাই না মর্তমান কলা?

অবশেষে, আর থাকতে না পেরে, শ্যামভরত চুরির কথাটা কর্তার কাছে বলেছে। কর্তা হুকুম দিয়েছেন—"চোরকো পাকড়লেয়াও—"

চোর পাকড়ানো-অবস্থাতেই ছিল, সুতরাং তাকে ধরতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। কর্তা তৎক্ষণাৎ রামভরতকে, শ্যামভরতের সাহায্যে, থানায় ধরে নিয়ে পুলিশের হাতে সমর্পণ করেছেন।

সাতদিন ধরে বারাসতের আদালতে এই চুরির বিচার চলেছিল। রামভরত আসামী, শ্যামভরত সাক্ষী। রামভরত আসামীর কাঠগড়ায়, তার হাতে হাতকড়া—শ্যামভরত ভাইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে। আবার শ্যামভরত যখন জবানবন্দী দেয় তখন রামভরতকে ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসতে হয়।

অবশেষে রামভরতের একমাস জেলের হুকুম দিলেন হাকিম। রামভরতকে জেলে নিয়ে গেল, কিন্তু শ্যামভরতকেও সেই সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। অথচ শ্যামভরতের জেল হয়নি। মহামুস্কিল ব্যাপার।

নির্দোষের অকারণ সাজা হতে পারে না। অগত্যা, রামভরতকে জেল থেকে খালাস দিতে হল।

খালাস পাওয়া মাত্র রামভরত বলা নেই কওয়া নেই, ভাইকে ঠেঙাতে শুরু করে দেয়। তাদের জীবনে এই প্রথম ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব। শ্যাম রামকে ঘুষি মেরে ফেলে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও গিয়ে পড়ে তার ঘাড়ে, তারপর দুজনে জড়াজড়ি, হুটোপাটি, তুমুল কাণ্ড। রাস্তার লোকেরা মাঝে পড়ে বাধা দেয়। দুজনকে আলাদা করবার চেষ্টা করে, কিন্তু আলাদা করতে পারে না। অল্পক্ষণেই বুঝতে পারে দুজনকে তফাৎ করা তাদের ক্ষমতার অসাধ্য। কাজেই তাদের ছেড়ে দেয় পরস্পরের হাতে। তারাও মনের সুখে মারামারি করে। অবশেষে দুজনেই জখম হয়, তখন একই স্ট্রেচারে দুজনকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতাল থেকে ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে ছেড়ে দেবার পর দুজনে বেরিয়ে আসে। পাশাপাশি চলে কিন্তু কেউ একটি কথা বলে না। রামভরত গুরু গম্ভীর, শ্যামভরত ভারি বিষণ্ণ। রামভরত আস্তে আস্তে হাঁটে, মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মোছে। শ্যাম থেকে থেকে ঘাড় চুলকোয়, সেই ফাঁকে আড় চোখে ভাইয়ের মুখের ভাব লক্ষ্য করার চেষ্টা করে।

দুভাই চুপ করে চলে।

অবশেষে রামভরত আফিমের দোকানের সামনে এসে পৌঁছয়। একটা টাকা ফেলে দ্যায় দোকানিকে। একভরি আফিং কেনে, কিনেই মুখে পুরে দ্যায় তৎক্ষণাৎ।

শ্যামভরত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, রামভরত কিন্তু উদাসীন। শ্যামভরত মাথা চাপড়ায়, রামভরত এক ঘটি জল খায়। শ্যামভরত চায় ভাইকে নিয়ে তখুনি আবার হাসপাতালের দিকে ছুটতে, রামভরত কিন্তু গির্দা ঠেস দিয়ে একটা খাটিয়ায় বসে পড়ে।

শ্যামভরত তখন কেঁদে ফেলে, বলে, "একি করলি ভাইয়া !"

রামভরত ভারি গলায় জবাব ছ্যায়—"কলা খেলে আফিং খেতে হয়।"

"আচ্ছা এবার তুই যত খুশি কলা খাস, আমি আর বলব না।" শ্যামভরত লুটিয়ে পড়তে চায় মাটিতে।

রামভরত গম্ভীর হয়ে ওঠে। "আফিং খেলে আর কলা খেতে হয় না।"

এই কথা বলে সে খাটিয়ায় উপর সটান হয়।

রামভরত মারা যায়, আর শ্যামভরত ?

শ্যামভরতকে যেতে হয় সহমরণে।

কবি সম্বর্ধনা



অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রামবাবু একজন মস্ত বড় সাহিত্যিক। তোমরা না জানলেও তোমাদের দাদারা তার নাম জানে। আর যদি কোন দিন মোহন-বাগানের ম্যাচ দেখতে গিয়ে থাক ত তাকে তোমরা সেণ্টার ফ্ল্যাগের কাছে গ্যালারির সব চেয়ে নীচের ধাপে দেখে থাকবে। বয়েস বেশি নয়, কিন্তু দেখতে একটি আস্ত গণ্ডার। যেমন থলথলে মোটা ভুঁড়ি, তেমনি গাছের গুঁড়ির মত হাত-পা। তার ওপর ঘাড় নেই বললেই চলে—মাথাটা টাইম-পিস ঘড়ির মত এই একটুখানি—স্ক্রুর মতো কাঁধের ওপর এঁটে বসেছে। তবু ত মাঠে তাকে তোমরা জামা গায়ে দেখে থাকবে, কিন্তু মোহনবাগানের গুঁফে.দা যেদিন ডারহ্‌মসকে গোল দিল, সেদিন গায়ের জামা কুটি-কটি করে ছিঁড়ে ফেলে তাঁর সেই প্রলয়-নিত্য দেখ নি? ও হরি! যেমনি জামা তাঁর ছিঁড়ে ফেলা, অমনি নৃত্যের প্রাবল্যে তাঁর ভুড়ির খাঁজ থেকে পয়সা-আনি, বিড়ি ও দেশলায়ের কাঠি টপাটপ ঝরে পড়তে লাগল। ঐ ভুঁড়িটি তাঁর পৈতৃক মনি-ব্যাগ। পকেট-কাটারা কোন কালেই ঐ বিরাট গোলক ধাঁধার সন্ধান পাবে না।

চেহারা দেখেই যদি নাক সিঁটকাও তবে তোমাদের তারিফ করতে পারব না, কেন না, পড় নি সেই কথাটা—যা কিছু ঝকঝক করে সব সোনা নয়? রামবাবু একজন মস্ত কবি, কে জানে হয় ত একদিন তাঁরই পদ্য তোমাদের মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশ করতে হবে। এখন না হয় তাঁর নাম হয় নি, কিন্তু কবিদের সুখ্যাতি নাকি তাদের মৃত্যুর পরেই হয়ে থাকে। অতএব রামবাবুরও সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে না। নাম একদম কিছু হয় নি, তাই বা বলি কি করে? বাড়িতে স্ত্রী না হয় উঠতে বসতে মুখ ঝামটা দেয়, কবিতার খাতায় আগুন করে দুধ গরম করে, কিন্তু হীরুকে জান ত? কাঁসারিপাড়ার সেই হীরু? মিত্র ইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে সাত বছর যে বসে আছে? বা, হীরুকে

জান না? আমি আর কি বলব,—তোমাদের দাদাদের জিগগেস কর—তাঁদের কেউ নিশ্চয় তার সঙ্গে পড়েছেন। সেই হীরু রামবাবুর একজন প্রধান ভক্ত—লাইনের সঙ্গে লাইন মিলিয়ে সেও রামবাবুর মত আকাশে উড়তে চায়! রামবাবুর জন্য সে ম্যাচে গ্যালারিতে জায়গা রাখে—এবং তাঁর জন্য জায়গা রাখবার অর্থ, হীরুকে তক্তার ফালিটার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকতে হয়। তবু অত বড় কবি তার পাশে বসবে সেইটেই হীরুর অহঙ্কার। খেলার মাঠে রামবাবু যে চীনে-বাদাম খান তার খোসাগুলি হীরু সযত্নে কুড়িয়ে রাখে—কে জানে, হয় ত একদিন এই স্মৃতিচিহ্নগুলির ভয়ানক দাম হবে—হীরুকে কষ্ট করে আর ম্যাট্রিক পাশ করতে হবে না।

একদিন অতি কাঁচুমাচু হয়ে হীরু রামবাবুকে বললে—'আমার দাদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি একদিন আপনাকে আমাদের বাড়িতে চা খাবার কথা বলে দিলেন। গরীবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন না দয়া করে? কথাটা বলি বলি করেও এতদিন বলতে পারছিলাম না, আপনার সময়ের ত কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে। তবু যদি—'

রামবাবু জিগগেস করলেন, 'কে তোমার দাদা?'

চোখ কপালে তুলে হীরু বললে,—'বাঃ, দাদাকে চেনেন না? তিনি একজন মস্ত সমালোচক—আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। লোকে আপনাকে এখনও ঠিক বুঝতে পারে নি, কিন্তু দাদা বলেন, আপনি রবি ঠাকুরের চেয়েও এক হিসাবে বড় কবি।'

রামবাবু গলে গিয়ে বললেন,—'সেই কথাটা দেয়ালে প্ল্যাকার্ড মেরে তোমার দাদাকে রটিয়ে দিতে বল না? যাব একদিন। এমন গুণীর সঙ্গে দেখা না করে পারি? কালকেই যাবখন—কি বল?'

খুশিতে গদগদ হয়ে দুহাত কচলাতে-কচলাতে হীরু বললে,—

'আপনার দয়া। কাল ম্যাচ নেই—ধরুন এই ছটার সময়। আমি জগু-বাজারের ষ্টপে আপনার জন্তে দাঁড়িয়ে থাকব। আপনি আসবেন শুনলে আমাদের পাড়ায় হৈ-চৈ পড়ে যাবে। যাবেন দয়া করে। গণ্যমান্ত আরও দুপাঁচজনকে ডাকা হবেখন।

আনন্দে দিশেহারা হয়ে রামবাবু বাড়ি ফিরলেন। এই তাঁর প্রথম প্রকাশ্য সম্বর্ধনা হচ্ছে। শুধু ফাঁকা স্তুতিবাদ নয়, দস্তুর মত এক পেট ভোজন। বিলিতি কায়দায় একেবারে চায়ের টেবিলে নেমন্তন্ন! খবরটা কাল আনন্দবাজার পত্রিকায় বের করতে হবে।

পরদিন বিকালে তাঁর সাজ-গোজের বিরাট আয়োজন দেখে রাম বাবুর স্ত্রী বললে, 'এত সেজে-গুজে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রামবাবু এসেন্সের শিশির মধ্যে কর্কটা ডুবিয়ে নিয়ে গোঁফের ওপর বারে বারে ঘসছেন। বললেন, 'দেখ ত নাপতে ব্যাটা ঘাড়টা কেমন চেঁচেছে!'

মুখ ঘুরিয়ে স্ত্রী জিগগেস করলে,—'কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনতে পাই?'

'—আর বোল না, তোমরা তো কবির সম্মান করতে শিখলে না, কিন্তু তাই বলে বাংলা দেশের সব পাঠক ত তোমাদের মত মূর্খ নয়, তারা আমায় বুঝতে শিখেছে। জানলা-দরজা ভেজিয়ে কতকাল আর সূর্যের আলো ঠেকিয়ে রাখা যায় বল?'

স্ত্রী বললে,—'তা ত বুঝলাম, কিন্তু রাত্রে আজ মাংস রাঁধব ভেবেছি—সকাল-সকাল ফিরব, বুঝলে?'

'দুত্তোর তোমার মাংস!' রামবাবু ধমকে উঠলেন, 'এদিকে আমার চায়ের নেমন্তন্ন, আর উনি যাচ্ছেন মাংস রাঁধতে! পৃথিবীর কোন খবর ত আর রাখ না। আমার ভক্তরা মিলে আমাকে আজ অভিনন্দন দিচ্ছে। অভিনন্দন মানে জান? বানান কর দেখি? হ্যাঁ, তোমাকে বোঝাতে গেলেই হয়েছে!'

'অত কথা শুনতে চাই না। রাত্রে কোথা থেকে যেন খেয়ে এস না।'

'—খেয়ে আসব না মানে?' রামবাবু একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। 'আমার কি না চায়ের নেমন্তন্ন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাত্র একবাটি চা নয়, কেইক, পেইসট্রি, স্যাণ্ডউইচ, ক্রিমরোল, ক্রিমক্র্যাকার—নাম শুনেছ কোন কালে? রাত্রে আমি কিছু খাব না, বুঝলে? মার্বল-টপ টেবিলে বসে খাওয়া—তোমায় তার কি বোঝাব?

রামবাবু ভবানীপুরের বাস ধরলেন।

কিন্তু জগুবাবুর বাজারের কাছে নেমে হীরুকে কোথাও দেখা গেল না। ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই, আরও খানিকক্ষণ দাঁড়ান যাক। লোকজন জোগাড় করা, গ্যাস জ্বালান, খাবার-দাবার ফরমাস করা—সব ত একা করতে হচ্ছে। একা কোন গাড়ি বা না ঠিক করতে হয়। রামবাবু গ্যাস-পোষ্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঐ, ঐ আসছে হীরু। ও নতুন কবি হচ্ছে কি না, তাই সময় সম্বন্ধে ঠিক ধারণা নেই। রামবাবুর কাছে এসে হীরু বললে,—'এই নামলেন বুঝি বাস থেকে? আসুন, আসুন,—বাস যা থেমে-থেমে চলে!

রামবাবু বললেন,—'কিন্তু এখন টি-টাইম ছেড়ে যে প্রায় ডিনার টাইম হয়ে গেল।'

হীরু হাত কচলাতে-কচলাতে বললে,—'হেঁ, হেঁ,—তাতে কি! চলুন।'

প্রকাণ্ড বাড়ি—হীরুরা বনেদি বড়লোক। কিন্তু দরজায় না ঝুলছে আমপাতার মালা, না দেখা গেল কলাগাছ পোতা। লোকজনের সাড়া-শব্দ নেই। কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। উদ্বিগ্ন হয়ে রামবাবু জিগগেস করলেন, 'আর কেউ এখনও আসেন নি বুঝি?'

হীরু বিনয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বললে,—'দাদা সবাইকে বারণ করে দিলেন। বললেন, 'কবির সঙ্গে আলোচনায় বাজে লোকের ভিড় বাড়িয়ে কাজ নেই।'

মুখখানা হাঁড়ি করে রামবাবু হীরুর সঙ্গে উঠোন পেরিয়ে একটা ঘরে ঢুকলেন। ছোট, নোংরা ঘর—কাঠের দেয়াল দিয়ে ঘেরা—মেঝের ওপর ফরাস পেতে খালি গায়ে একটা লোক বসে আছে। লোকটার কোলের কাছে একটা জলচৌকি—তাতে সে একটা কাগজ পেতে কি-জানি সব লিখে চলেছে। বয়েস প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। রামবাবু ঘরে ঢুকতেই প্রকাণ্ড ছায়া পড়ে ছোট ঘরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে গেল। লোকটা চোখ তুলে তাকাল। হীরু পরিচয় করিয়ে দিলে—'দাদা, ইনিই হচ্ছেন রামবাবু। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

হীরুর দাদা গায়ের ওপর তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁটটা জড়াতে-জড়াতে বললে—'বসুন, বসুন। যা হীরু, শিগগির যা, ঠাকুরকে জল চাপাতে বলে দিয়ে আয়।'

হীরু বাড়ির ভেতর চলে গেল, আর রামবাবু জড়-সড় হয়ে মেঝের ওপরই বসে পড়লেন। নিরাশ হয়ে লাভ নেই, ভক্তের দল না-ই বা এল, তবু পেট পুজোই বা এ দুর্দিনে কজনে করাতে চায়। তাই মুখে হাসি টেনে রামবাবু জিগগেস করলেন,—'কি লিখছেন? ...আমার কবিতা সম্বন্ধে কোন আলোচনা নাকি?'

কাগজটা তাড়াতাড়ি উলটে রেখে হীরুর দাদা বললে,—'না, না, একটা সাবসট্যান্স লিখছি। পরীক্ষা এই এসে পড়েছে।'

'—পরীক্ষা! পরীক্ষা কিসের?'

'—আর বলেন কেন? ম্যাট্রিকটাই এই বছর আষ্টেক ফেল মারছি। এই যে, হীরু এসেছিস। জলের কদ্দূর?'

হীরু বললে,—বৌদি ধমকে দিলে, বললে, 'উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি বারে বারে নামান যাবে না।'

হীরুর দাদা বললে,—'আচ্ছা, আচ্ছা, উনি না-হয় একটু বসছেন। কি বলেন, এক পেয়ালা চা খেয়ে গেল আর ক্ষতি কি!……নতুন আর কি লিখলেন?…দেখুন, আপনার সম্বন্ধে আমি একটা দীর্ঘ সমালোচনা লিখব।'

রামবাবু উৎসুক হয়ে বললেন,—'কি নিয়ে? আমার কবিতা না গল্প?'

'ও-সব বাজে আলোচনা। আমি লিখব আপনার নাম নিয়ে। আপনার সমস্ত মাহাত্ম্য ঐ নামে। আপনি যে সবাইর চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা আপনার নামেই বোঝা যাচ্ছে।'

'আমার নামে?'—রামবাবু বিস্ময়ে হাঁ করে রইলেন।

হীরুর দাদা বলতে লাগল,—'এই দেখুন না, ছাগলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে রামছাগল, পাখির মধ্যে রামপাখি, দা-র মধ্যে রাম-দা,—তেমনি কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আপনি রামকবি! কি, সত্যি কি না?'

রামবাবুর ত চক্ষু স্থির! হীরু কতক্ষণে খাবারের থালাটা নিয়ে আসে (কেননা নিতান্ত দেশি মতে তাঁর অভ্যর্থনা হচ্ছে) তারই আশায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন।

হীরু এসে বসল। রামবাবু বললেন,—'রাত হয়ে যাচ্ছে, হীরু।'

মুখের কথাটা লুফে নিয়ে হীরুর দাদা বললে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ আর ওঁকে বসিয়ে রেখ না। উনি ত আর তোমার মত ভবঘুরে নন, সময়ের ওঁর দস্তুর মত দাম আছে। এতক্ষণে দু চারটে কবিতা গজিয়ে যেত, কি বলুন?'

হীরু বললে,—'বা, আর একটু বসুন। চা আসছে।'

চা আসছে! আঃ! রামবাবু কোমরের কসিটা নামিয়ে ভুঁড়িটাকে একটু আলগা দিলেন।

কিন্তু উড়ে চাকরের হাতে নেহাৎই এক পেয়ালা চা মাত্র। তার পেছনে বহু দূর পর্যন্ত আর কাউকে দেখা গেল না।

হীরু গর্জে উঠল, 'কি রে, চায়ে দুধ দিস নি একেবারে? দে, আমার কাছে দে।' বলে কাপটা চাকরের হাত থেকে তুলে নিয়ে হীরু ফের ভিতরে চলে গেল। হীরু যখন গেছে, তখন অমনি শুধু হাতে আর আসবে না নিশ্চয়ই!

হীরুর দাদা কাগজটা রামবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে,—'আপনি ত এত সব লেখেন, দয়া করে আমার এই সাবসট্যান্সটা লিখে দিন না। দাঁত ফোটায় কার সাধ্যি? এখুনি আবার মাষ্টার-মশাই এসে পড়বে।'

এত বড় ধাড়ির আবার মাষ্টার! রামবাবু বললেন,—'আমার এখন সময় হবে না।'

হীরুর দাদা বললে,—তা যা বলেছেন। মিছিমিছি হীরু আপনাকে অমনি বসিয়ে রেখেছে কেন? চায়ে দুধ একটু কম হলে কি হয়?'

রামবাবু গুম হয়ে তবু বসে রইলেন। যাক, ঐ হীরু আসছে। কিন্তু পেছনে আর কেউ নেই ত, দু দুবার যাওয়া-আসা করায় পেয়ালায় চা-ও অর্ধেক হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা, কালো চা, ওপরে ছাঁকা-ছাঁকা কতকগুলি সর ভাসছে।

চায়ে নাকি ক্ষুধা নষ্ট হয়, সেই ভরসায় রামবাবু এক চুমুকে তলানি সুদ্ধু পেয়ালাটা সাবাড় করে ফেললেন। হীরুর দাদা হীরুকে বললে—কি রে তুই, ভদ্দরলোক এল—এত বড় নামজাদা রাম-লেখক, তাকে কিছু খাবার পর্যন্ত খাওয়ালি না?......তা, বাজারের বাজে খাবারে খালি পেট খারাপ করে। নিন, আমার এই পান নিন, মিঠে

পান, আস্ত একটি এলাচ দিয়ে সাজা।' বলে হীরুর দাদা ট্যাক থেকে ডিবে বার করে খুলে এক রত্তি একটি পান রামবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে।

পানটি মুখে পুরতেই হীরুর দাদা ফের হীরুকে বললে,—'ওঁকে তুই কতক্ষণ বসিয়ে রাখবি? এতে তুই বাংলা-সাহিত্যের কি ক্ষতি করছিস কিছু খেয়াল আছে?'

হীরু রামবাবুকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে,—'যে চায়ের পেয়ালায় আপনি আজ চুমুক দিলেন, সেটা আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখব।'

রামবাবু বললেন,—'শুধু-শুধু অতগুলি টাকা খরচ করবে কেন? তা দিয়ে বরং আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা কোর!' বলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু উদরে তখন আগুন জ্বলছে। ঐ আধ কাপ চা যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। এখন তিনি কি করেন? বাড়ি ফিরে এখন খেতে চাইলে তাঁর সমস্ত কবি-সম্মান মাঠে মারা যাবে। লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারবেন না।

হায়, বাড়িতে আজ মাংস হচ্ছিল! ঘ্রাণে সমস্ত ঘর-বাড়ি আমোদিত হয়ে আছে! বাটিতে-বাটিতে সবাই হয়ত কত ফেলে-ছড়িয়ে খাচ্ছে! থালার ধারে-ধারে চিবনো হাড়ের সব পাহাড় উঠে গেল। আর তাঁর ভাগ্যে কি না আধ কাপ কেলে-কুষ্টি, তেতো চা!

রামবাবু দিগ্বিদিক না তাকিয়ে একটা খাবারের দোকানে ঢুকে পড়লেন। প্রকাণ্ড একটা ঠোঙা সাজিয়ে রাজ্যের খাবার নিয়ে তিনি গিলতে সুরু করলেন। কিন্তু দাম দেবার সময় পকেট হাতড়ে—য়্যাঁ! মানি-ব্যাগ! মানি-ব্যাগ কোথায়? ভদ্রলোক সাজতে গিয়ে টাকাপয়সা যে চামড়ার থলিতে করে তিনি পকেটে রেখেছিলেন! সর্বনাশ! এখন কি হবে? চায়ের কাপ সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখবার জন্য আলগোছে হীরু হয় ত সেটা তুলে নিয়েছে।

দোকানদাররা সব তাঁকে ঝাপটে ধরলে, বললে,—'খেয়ে দাম না দিয়ে ঠকাবার মতলব! পুলিশ ডাকব এখনি।'

রামবাবু বললেন,—'আমাকে তোমরা চিনতে পাচ্ছ না। আমি আড়াইটে টাকা নিয়ে পালাব না?'

'—পালাবে না? তবে হাতের ঐ আংটি, সার্টের ঐ বোতাম রেখে যাও। অমন ঢের জোচ্চোর আমরা দেখেছি।'

অতএব ঐ সব দামি আংটি আর বোতাম দিয়ে রামবাবু ছাড়া পেলেন।

বাড়ি ফিরলে স্ত্রী জিগগেস করলে—'কি হল?'

রামবাবু বললেন,—'জোয়ানের আরকের শিশিটা শিগগির দাও ত। যা এক গাদা খাইয়ে দিয়েছে—মাংস, চপ, পোলাও—অত শত কি নাম জানি? রাজ্যের খাতায় নিজের নাম দস্তখত করতে করতে আঙ্গুলগুলি ব্যাথা হয়ে গেছে। বলে রামবাবু আঙ্গুল মটকাতে লাগলেন।

'হ্যাঁ, তোমার আংটি কোথায়?'

রামবাবু হেসে বললেন,—'আমার এক ভক্ত এক নাগাড়ে আমার কবিতা এত মুখস্ত বলতে লাগল যে, তাকে ওটা প্রাইজ দিয়ে ফেলেছি। নইলে যে মান থাকে না। তবে ছেলে-মানুষ ভক্ত, কাল ভাবছি গোটা আড়াই টাকা দিয়ে ওটা ছাড়িয়ে নিয়ে আসব। কি বল?'

'—আর দিয়েছে?'

রাম বাবু বললেন,—'না দিল ত বয়ে গেল। ভারি ত একটা আংটি। যা সম্মান আজ পেলাম, পৃথিবীতে কোন অর্থ ভাণ্ডারে তার উপযুক্ত দাম নেই।' বলে তিনি প্রচুর হাসতে লাগলেন।

দিনের খোকা—রাতে



রবীন্দ্রলাল রায়

খোকা—সন্তোষবাবুর খোকা। সুন্দর ফুটফুটে, গোলগাল—চমৎকার। মুখে হাসিটি লেগেই আছে—কাঁদতে সে জানেই না। চমৎকার মিষ্টি আধ-আধ কথা—দিনের মধ্যে কত কথাই যে বলে তার ঠিক নেই। বয়স ত বোধ হয় এখনও পাঁচ বছর পূরো হয় নি কিন্তু কথা বলে যেন কত কালের বুড়ো। কখন কি বলে তার ঠিক নেই—আবোল-তাবোল কত কি? তার কথা বলা একটা শুনবার জিনিষ; রাস্তার লোকে দাঁড়িয়ে শোনে, পাড়ার মেয়েরা তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শোনে, পার্কে বেড়াতে গেলে তার পাশে লোক জড় হয়ে যায়—কখনও ভয় পায় না—যে লোকই সামনে থাক আর যত লোকই তাকে ঘিরে থাক, ঠিক অনর্গল বকে যাবে। পাড়ার মেয়েরা কেউ আদর করে ডাকে 'কলের গান', কেউ বা ডাকে 'তোতা পাখি'।

সন্তোষবাবু তাঁর ছেলের গর্বে গদগদ। কিন্তু বেচারার দুর্ভাগ্য এমনি যে এমন যে ছেলে তাকে তাঁর এতটুকু কাছে পাবার উপায় নেই, তার মুখের দুটো মিষ্টি কথা শুনবার এক মুহূর্ত অবসর নেই। তিনি ভোরবেলায় কাজে বার হয়ে যান, তখন খোকা থাকে ঘুমিয়ে, আবার সারাদিন পরে যখন কাজ থেকে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরেন তখন বেশির ভাগ দিনই খোকা পড়ে ঘুমিয়ে। এক-আধ দিন যদি জেগে থাকে তবেই তিনি খোকার একটু-আধটু কথা যা শুনতে পান—কিন্তু সে কতক্ষণ? সারাদিন দুষ্টুমির পর ক্লান্তিতে তার চোখ জড়িয়ে আসে—দেখতে দেখতে ঘুমে নেতিয়ে পড়ে। সন্তোষবাবুর আশ মেটে না।

খোকার মা যাবেন তাঁর বাপের বাড়ি মাসখানেকের জন্য। ঠিক হল খোকা মার সঙ্গে যাবে না, তার বাবার কাছে তার পিসিমার কাছে থাকবে। খোকা রোজ তার মায়ের বিছানায়, মায়ের কোলের মধ্যে শুয়ে থাকে। এই এক মাস খোকা তার বাবার বিছানায়, বাবার

কাছে শোবে। খোকার তাতে কোনও আপত্তি নেই, সে বাবার কাছে শুতে খুব রাজি।

সন্তোষবাবুর আজ মহা আনন্দ। খোকা তাঁর কাছে শোবে; খোকার মিষ্টি-মিষ্টি, পাকা-পাকা, আবোল-তাবোল কথা শুনবেন! আজ তিনি কাজ থেকে অন্য দিনের চেয়ে একটু তাড়াতাড়িই ফিরলেন! পথে কত কথাই ভাবতে ভাবতে চলেছেন। ভাবছেন, "খোকা, দুষ্টু খোকা নিশ্চয় তার বুড়ি পিসিকে সারাদিনে অস্থির করে তুলেছে বকে বকে। ঐ টুকু মাথায় কত অদ্ভুত কথাই আসে! পাগলা ছেলেটা! ওর মা ত রাগ করে বলেন, 'খোকার বকুনির জ্বালায় ক্ষেপে উঠলাম!' আচ্ছা, আজ দেখি খোকা আমাকে কেমন ক্ষেপাতে পারে! অমন মিষ্টি কথায় মানুষ নাকি বিরক্ত হয়? খোকার মার যত অন্যায়! আমার যদি সময় থাকত তা হলে না খেয়ে না দেয়ে রা-ত দিন ওর কথা শুনতে পারতুম। 'খোকা, আমার সোনা খোকা, মানিক খোকা, যাদু খোকা'—" ভাবতে ভাবতে সন্তোষবাবুর মনটা আনন্দে ভরে উঠছে। সারা দিন আজ তাঁর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি গেছে। অন্য দিন হলে রাস্তা দিয়ে ক্লান্তিতে টলতে টলতে বাড়ি ফিরতেন কিন্তু আজকে খোকার চিন্তা তাঁর সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিয়েছে—রাস্তা দিয়ে যেন তিনি উড়ে চলেছেন।

বাড়ি ঢুকেই ডাকলেন, "খোকা, খোকন বাবু, খোকন সোনা!"

খোকন সোনা ততক্ষণ ঘুমে অচেতন। তার পিসি বল্লেন, "সারা দিন দুষ্টুমি করেছে—এই ঘুমলো। একটু আগেও জিজ্ঞাসা করছিল, "পিসিমা বাবা কখন আসবে, এখনও আসছে না কেন?"

সন্তোষবাবু একেবারে মুষড়ে পড়লেন। ছিঃ, ছিঃ, আর একটু আগে বার হলেই হত। তাঁর নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছা হল। •

খোকাকে দু-একবার নাড়া দিলেন, ডাকলেন, "খোকন বাবু, ও খোকন। খোকন বাবু ততক্ষণে ঘুমিয়ে পাথর। সন্তোষবাবু হতাশ হয়ে পড়লেন। •

রাতের খাওয়া শেষ করে নিয়ে সন্তোষবাবু তাঁর বিছানাটিতে আশ্রয় নিলেন, কোলের কাছে খোকা রইল ঘুমিয়ে।

সারা দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর বিছানায় শুতে শুতেই সন্তোষ বাবু ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েন। ভোরে যখন উঠতে হয় তখনও উঠতে ইচ্ছে করে না মোটেই, মনে হয় যদি আরও একটু ঘুমনো যেত! আজও তিনি সারা দিনের পরিশ্রমের পর অঘোর-নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন।

রাত্রি তখন প্রায় একটা। খোকা ডাকল, "বাবা!" সে জেগেছে।

খোকার ডাকে সন্তোষবাবুর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। ভারি মিষ্টি লাগল খোকার ডাক। কিন্তু ঘুমে তখনও তাঁর চোখ জড়িয়ে রয়েছে। চোখ বুজে বুজেই কোলের কাছে টেনে নিয়ে খুব মিষ্টি করে উত্তর দিলেন, "কি বাবা?"

খোকা বললে, "তুমি বড় দুষ্টু হয়েছ।"

দুষ্টু, দুষ্টু—খোকার মুখে 'দুষ্টু' কি মিষ্টিই লাগছে সন্তোষ বাবুর! চোখ বুজেই সন্তোষবাবু বললেন, "দুষ্টু হয়েছি কেন বাবা?"

"দুষ্টু তো হয়েছই-ই, অত দেরি করে এলে কেন?"

"অপিসের কাজ শেষ না হলে আসব কি করে?"

"কাজ করতে হবে না তোমার, কাজ করলে আড়ি করে দেব।"

সন্তোষবাবুর মুখে হাসি ফুটে ওঠে—কিন্তু এ দিকে আস্তে আস্তে ঘুমও আসে আবার!

খোকা ডাকে, "বাবা!" সন্তোষবাবুর কানে যায় না, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

খোকা আবার ডাকল, "বাবা!" সন্তোষবাবুর এবার ঘুম ভেঙ্গে গেল, উত্তর দিলেন, "কি বাবা?"

"মা অপিসে যায় না কেন বাবা?"

"মা যে মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষে কি অপিসে যায় বোকা?"

"তুমি কি বাবা? মেয়েমানুষ নও?"

"দুর বোকা ছেলে, আমি পুরুষমানুষ; পুরুষমানুষ—ব্যাটাছেলে অপিসে যায়, বুঝলে? এখন ঘুমও।"

মিনিট কয়েক চুপ। তারপরেই আবার খোকা ডাকল, "বাবা!" সন্তোষবাবু ভাবলেন চুপ করে থাকব, নইলে ও আজ সারা রাত্রি বকবে। সন্তোষবাবুর ইচ্ছা থাকলেও ওর সঙ্গে বকতে পারছেন না, কারণ চোখ শুনছে না—চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। কিন্তু চুপ করে থাকলে কি হবে? খোকা তার বাবার গলা জুটো ধরে ডাকল "ও বাবা!"

সন্তোষবাবু উত্তর দিতে বাধ্য হলেন, "কি বলছ?"

"আমি কি বাবা? ব্যাটাছেলে না মেয়েমানুষ?"

"ব্যাটাছেলে।"

"তবে অপিসে যাই না কেন?"

"বড় হলে যাবে—এখন ঘুমোও, লক্ষ্মীছেলে।"

পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। খোকা আবার ডাকল, "বাবা!"

সন্তোষবাবু ভয়ানক ঘুমুচ্ছেন, নাক ডাকতে সুরু করেছে।

"বাবা, বাবা, ও বা—বা?"

নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেল, সন্তোষবাবু খোকার দিকে পিছন ফিরে শুলেন; বল্লেন, "কি বলছ?"

"তুমি জেগে আছ বাবা ?"

"জেগে ছিলাম না, তবে এখন জেগে আছি বটে।"

"আমিও জেগে আছি বাবা।"

"সে তো দেখছিই; ঘুমাও, জেগে থাকতে হবে না আর।" সন্তোষবাবুর স্বর এবার আর মিষ্টি নয়; বরং একটু বিরক্তিতেই ভরা।

চুপচাপ অনেকক্ষণ। ঢং ঢং—ঘড়িতে দুটো বাজল। সন্তোষ বাবুর আবার সজোরে নাক ডাকছে।

খোকা বোধ হয় এবার ঘুমিয়েছে—না, আবার ডাকছে, "বাবা।" উত্তর নেই।

"বাবা, বাবা, বাবা, ও বা—বা, বা—বা !"

"কি বলছ ?" বেশ তাড়া দিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন সন্তোষবাবু।

"কিছু না।"

"কিছু না ত চেঁচাচ্ছ কেন? তোমার চোখে কি ঘুম নেই ? ঘুমাও শিগগির।"

আবার খানিকক্ষণ চুপ। তার পরেই—"বাবা !"

"আবার বাবা ? কি বলছ পাজি ছেলে ?"

"তোমার যদি অনেক টাকা হয় তা হলে আমাকে কি কিনে দেবে ?"

"কিছু না—কিছু না।" সন্তোষ বাবু ভীষণ বিরক্ত।

"না, কিনে দিতে হবে, হুঁ—" একটু আবদারে ভরা কান্নার স্বর।

সন্তোষবাবু দেখলেন মহা মুস্কিল, বল্লেন, "আচ্ছা রেলগাড়ি কিনে দেব।"

ব্যস্, খোকা এতক্ষণ তবু শুয়েছিল, এবার একেবারে উঠে বসল।

"রেলগাড়ি দেবে বাবা ? ইষ্টিমার রেলগাড়ি—হুস হুস, ঘ্যাচা ঘ্যাচা, হুস হুস, ঘ্যাচা ঘ্যাচা, ঘ্যাচা ঘ্যাচা, হুস হুস !"—খোকার হাত দুটো রেলের চাকার মত ঘুরতে লাগল।

রাত তিনটে, সন্তোষবাবুর চোখ দুটো কটকট করছে; সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি—ঘুমে চোখ দুটো ঢুলে আসছে অথচ ঘুমাতে পারছেন না; মাথাটা ভীষণ রকম ধরে উঠেছে।

"বাবা, আমার যখন অনেক টাকা হবে তখন তোমাকে রেলগাড়ি ইষ্টিমার, বিস্কুট, লজেঞ্চুস, কুকুরের বাচ্চা—আর ঘড়ি, আর তিন চাকার সাইকেল, কুল, পেয়ারা আর—আর—"

"আর কিছু না, ঘুমাও—নইলে এবার ভীষণ শাস্তি দেব।"

অনেকক্ষণ চুপচাপ! এবার সে এতক্ষণে নিশ্চয় ঘুমিয়েছে, রাত এখন তিনটে! যাক, তবুও ত দুঘণ্টা এখনও ঘুমনো যাবে। সন্তোষ বাবু একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে ভাল করে শুলেন।

"বাবা!"

সন্তোষবাবু এবার রীতিমত ক্ষেপে গেছেন; খোকনকে একলা ফেলেই উঠে চললেন অন্ধকারের মাঝে। মাঝখানে ছিল খোকন বাবুরই ট্রাইসিকেলটা; ভয়ানক জোর ধাক্কা লাগল তার সঙ্গে, হাঁটুর কাছে ভীষণ চোট লাগল: যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এসে আবার বিছানায় বসে পড়লেন—পাটায় ভয়ানক ব্যথা করছে।

"বাবা, তোমার লাগল? তুমি অন্ধকারে দেখতে পাও না বুঝি? আমিও পাই না।"

সন্তোষবাবু এবার খেঁকিয়ে উঠলেন—"বাঁচিয়েছ, হতচ্ছাড়া, পাজি ছেলে, সারারাত একটু চোখের পাতা বুজতে দিলে না—"

"বাবা!"

"কী, কী, কী—ঈ—ঈ, শূয়োর ছেলে?"

"তুমি 'অভয়' বানান করতে পার বাবা? আমি পারি—অ—ভ— আর একটা কি বাবা?"

"আর কিছু নয়, তুমি ঘুমাও।" সন্তোষবাবু দেখলেন, কথার উত্তর

দিলে তার কথার শেষ হবে না—তাড়া দিলেও থামবে না, ভোলাতে হবে। বল্লেন, "খোকন সোনা, ঘুমাও ত এবার, তুমি যদি এক্ষুণি চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড় তা হলে কালকে তোমাকে একটা ট্রামগাড়ি কিনে দেব। লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে, ঘুমাও ত বাবা!"

"কিনে দেবে বাবা? আচ্ছা আমি এক্ষুণি ঘুমাব। আমি তোমার লক্ষ্মী সোনা ছেলে—কত লোকের আমার মত খোকন নেই। তোমার ত আমি একটা খোকন, আরও খোকন হবে বাবা—এক দুই, পাঁচ দশ, উনিশ এ-ক-শ, পাঁ-চ-শ।" এবার সে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল।

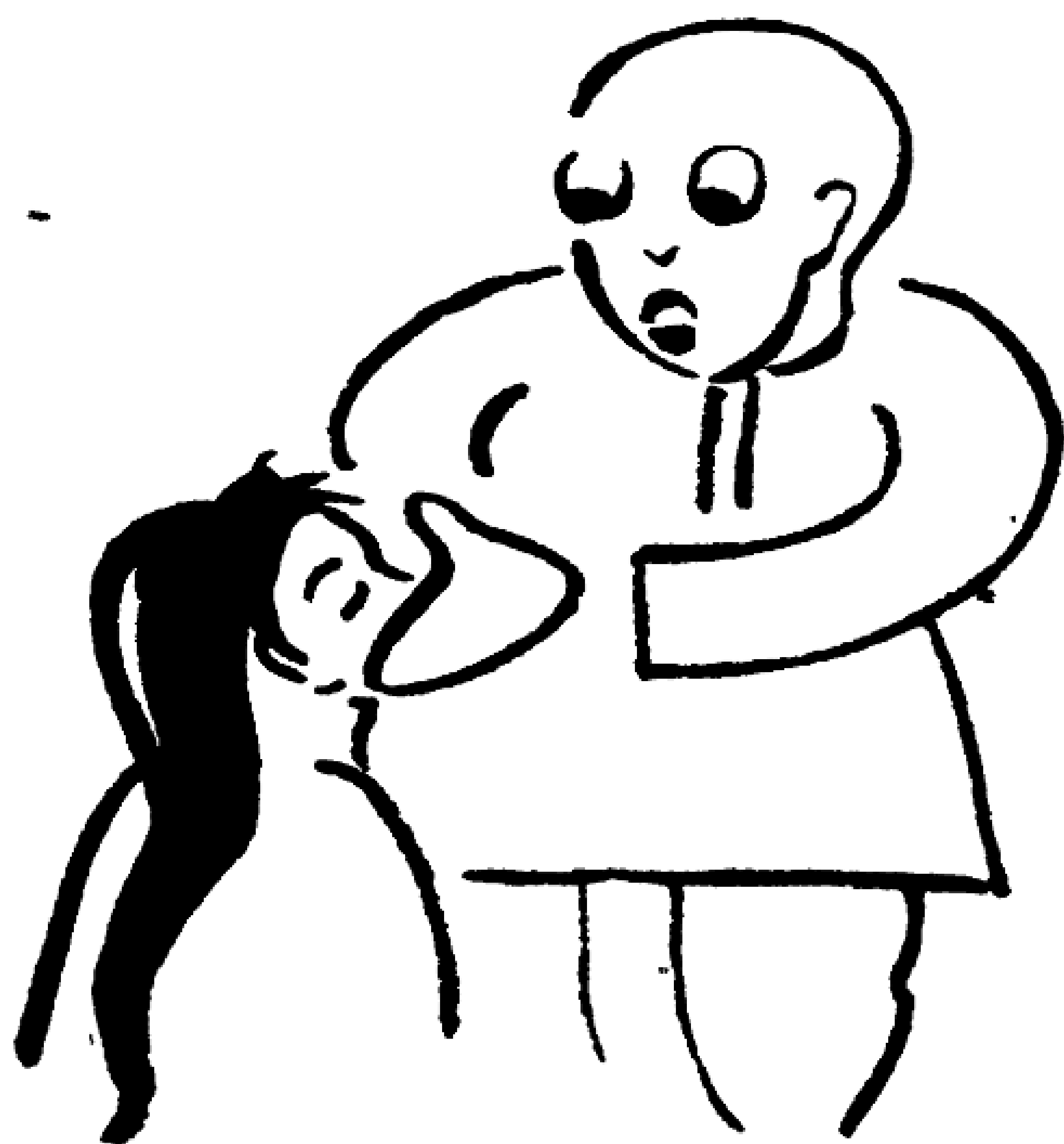
সন্তোষবাবু মনে মনে বললেন, "ঈশ্বর রক্ষা কর, একটি খোকনেই অস্থির, আর যদি"—তিনি ভয়ে শিউরে উঠলেন।

সন্তোষবাবু পাশ ফিরে শুতে গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং ঢং করে চারটে বাজল। আর ঘুমান চলে না, তা হলে দেরি হয়ে যাবে।

সন্তোষবাবু পাঁচটায় কাজে বার হয়ে গেলেন—দেখলেন সারারাত বকর বকর করে এখন নিশ্চিন্ত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে খোকা ঘুমুচ্ছে।

[redacted] সারারাত জেগে, তার পর আজ সারাদিন খেটে সন্ধ্যায় সন্তোষবাবু কোনও রকমে টলতে টলতে বাড়ি ফিরছেন। কাল এমন সময় খোকনকে পাশে নিয়ে শোবেন ভেবে তিনি আনন্দে অধীর হচ্ছিলেন, আর আজ তাকে কাছে নিয়ে শুতে হবে ভেবে ভয়ে শিউরে উঠছেন আর ভাবছেন—খোকনের মার ফিরতে এখনও উনত্রিশ দিন বাকি! সবে ত এই এ—ক দিন গে—ল।

কর্তার বাড়ির যাত্রা



মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কর্তা ভারি বদ-মেজাজী। কেউ যদি তাঁর কথা না শোনে, কিংবা তাঁর মুখের উপর কেউ কোন কথা বলে তাহলে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন; তখন যা কাণ্ড করে বসেন তা আর বলবার নয়! সেই জন্য বাড়ির সবাই, পাড়া-প্রতিবেশী সকলে কর্তার সঙ্গে একটু হিসেব করে সমঝে চলে।

কর্তার বাড়ি যাত্রা হচ্ছে—সীতাহরণের পালা। বাড়ির উঠোনে লোকে থৈ থৈ করছে। কর্তা আসরের মাঝখানে বসে একেবারে তন্ময় হয়ে যাত্রা শুনছেন আর মাঝে-মাঝে বাহবা দিচ্ছেন। তাঁর মুখের বাহবা শুনে ছোট ছোট ছেলের দল মহা ফুর্তিতে চটাপট হাততালি দিয়ে উঠছে। কর্তা তাতে ভারি খুশি। মাঝে-মাঝে ফোগলা দাঁত বেরিয়ে পড়ছে। যাত্রা খুব জমে উঠেছে।

পঞ্চবটী বন। রাম-সীতা-লক্ষ্মন তিন জনে উপস্থিত। জুড়ির দল সবেমাত্র গান শেষ করেছে, এমন সময় দর্শকদের ভিড়ের পিছন থেকে পোকায় কাটা একখানা হরিণের ছাল মুড়ি দিয়ে একটা লোক আসরের মধ্যে তড়াক-করে লাফিয়ে পড়ল। সীতা অমনি বলে উঠলেন—"দেখ, দেখ আর্যপুত্র, কি সুন্দর হরিণ! কেমন সোনার মত রং! আমায় ঐ হরিণটি ধরে দাওনা।"

রামচন্দ্র কি বলতে যাচ্ছিলেন, তাকে বাধা দিয়ে কর্তা সজোরে ধমকে উঠলেন—"এই, হরিণ চাসনে!"

কর্তার সেই গম্ভীর গলা শুনে রাম-সীতা দু-হাত পিছিয়ে গেল; শ্রোতারা অবাক হয়ে কর্তার দিকে চাইলে। দেখা গেল কর্তা সীতার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছেন। কেউ কিছু বুঝতে পারলে না। যাত্রা আবার চলতে লাগল।

সীতা বলতে লাগলেন—"ঐ দেখ আর্যপুত্র, সোনার হরিণ পালিয়ে

যায়। চলে গেলে আর পাব না। তুমি এখুনি ওটাকে ধরে নিয়ে এস ;—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, ঐ হরিণটা আমায় এনে দাও।"

সীতার কথা শেষ না হতেই কর্তা আবার ধমকে উঠলেন—"ফের বলছি, হরিণ চাসনে!" বোধ হয় কর্তার সেই ধমকেই সোনার হরিণটা প্রাণপণে ছুটে পালাল ; আর রামচন্দ্রও ধনুর্বাণ-হাতে তার পিছনে-পিছনে ছুটলেন। তারপর সমস্ত আসর কাঁপিয়ে দূর থেকে মোটা গলায় চীৎকার উঠল—"ভাই, লক্ষ্মণ! ভাই লক্ষ্মণ! আমি মলুম, আমায় রক্ষা কর ; আমায় বাঁচাও।" আচমকা সেই বিকট শব্দ শুনে ছেলের দল একেবারে হতভম্ব! কর্তা কেমন হতাশ-ভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন।

সীতা হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলেন—"লক্ষ্মণ! আর্যপুত্র বিপদে পড়েছেন, ঐ শোন তোমায় ডাকছেন, তুমি যাও, এখুনি গিয়ে তাঁকে উদ্ধার কর!"

কর্তা বল্লেন—"চুপ কর পোড়ারমুখী!"

লক্ষ্মণ বল্লেন—"না দেবি! কোন ভয় নাই, দাদার কোন বিপদ হয় নি। ও কোন মায়াবীর মায়া হবে!"

সীতা কান্নার স্বরে বল্লেন—"না গো না,—ঐ শুনছ না, ও যে আর্যপুত্রের গলার স্বর।"

কর্তা বল্লেন—"হ্যাঁ তুই তো ভারি জানিস!"

লক্ষ্মণ বল্লেন—"দেবি! আপনার ভ্রম হয়েছে, ও আর্যপুত্রের কণ্ঠস্বর নয়।"

সীতা এবার রেগেছেন ; মনে করেছেন লক্ষ্মণ প্রাণের ভয়ে কুটীর ছেড়ে যেতে চাইছে না। তাই তিনি বলছেন,—"কাপুরুষ! কুলাঙ্গার! কদাচারী! ভীরু!"

গালাগালি শুনে লক্ষ্মন আর থাকতে পারলেন না, তিনি বল্লেন

—"আচ্ছা, আমি যাচ্ছি দেবি! কিন্তু যদি বাঁচতে চান তাহলে কিছুতেই এই গণ্ডি পার হবেন না।" বলে ধনুকের আগা দিয়ে একটা দাগ টেনে তিনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জুড়ির দল গান ধরলে "হায় হায় হায়"—খানসামা এসে কর্তার তামাক দিয়ে গেল।

গান থামতেই জটাজুটধারী কমণ্ডল-ত্রিশূল-হাতে এক সন্ন্যাসী এসে হাজির—"জয় হোক, ছুটি ভিক্ষা পাই।"

সীতা তাড়াতাড়ি কুটিরের ভিতর থেকে গোটাকতক রং করা মাটির ফল নিয়ে এসে গণ্ডির ভিতর থেকে বল্লেন,—"এই নাও ভিক্ষা।"

সন্ন্যাসী বল্লেন—"বেরিয়ে এসে ভিক্ষা দাও।"

সীতা এগিয়ে আসছিলেন, হঠাৎ গণ্ডির দিকে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়ালেন; সেইখান থেকে বল্লেন—"এই নাও ভিক্ষা।"

কর্তা তাকিয়া ছেড়ে হঠাৎ একেবারে সোজা হয়ে বসেই আবার হেলান দিয়ে তামাক টানতে লাগলেন।

সন্নাসী বল্লে—"কাছে এসে ভিক্ষা না দিলে ভিক্ষা নেব না।"

কর্তা বল্লেন—হ্যাঁ, ভারি আবদার! না নিবি ত চলে যা!"

সন্নাসী ভিক্ষা না নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে সীতা কাতর স্বরে বল্লেন—"না, সন্ন্যাসী, ভিক্ষা না নিয়ে যেওনা, আমাদের অকল্যাণ হবে। —গৃহস্থের ঘর থেকে কি অতিথি ফিরতে আছে।"

সন্নাসী ফিরে বল্লে—"তবে গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এস।"

সীতা বল্লেন—"দেবর লক্ষ্মণ যে বারণ করে গেছেন এখান থেকে বার হতে। একটু অপেক্ষা করুন, তিনি এলেই আপনাকে ভিক্ষা দেব।"

লক্ষ্মণের নাম শুনে সন্ন্যাসী রেগে গটগটিয়ে চলে যেতে লাগল।

কর্তা বল্লেন—"যা ব্যাটা যা।"

সীতা দেখলেন, অতিথি ভিক্ষা না নিয়েই চলে যায়—কি সর্বনাশ! তিনি কাতর স্বরে বল্লেন—"দাঁড়ান, চলে যাবেন না। আমি ভিক্ষা দিচ্ছি। আমার অদৃষ্টে যাই থাক, অতিথিকে বিমুখ হতে দেব না। অতিথি বিমুখ হয়েছে শুনলে আর্যপুত্র বলবেন কি!"

কর্তা বল্লেন—"থাক, অত ধর্মজ্ঞানে কাজ নেই!"

সীতা তখন গান ধরলেন—"হে মা মঙ্গলচণ্ডি! আমার অমঙ্গল না হয়! আমি গণ্ডি পার হচ্ছি—নইলে অতিথি বিমুখ হয়ে যায়! তুমি আমার মুখ চেয়ো মা!" সীতা এক-এক লাইন গাইছেন আর এক-এক পা গণ্ডির দিকে এগিয়ে আসছেন; আর কর্তা একটু একটু করে তাকিয়া ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে বিড় বিড় করে বলছেন—"খবরদার গণ্ডি পার হসনে! খবরদার গণ্ডি পার হসনে! পার হলেই মরবি!"

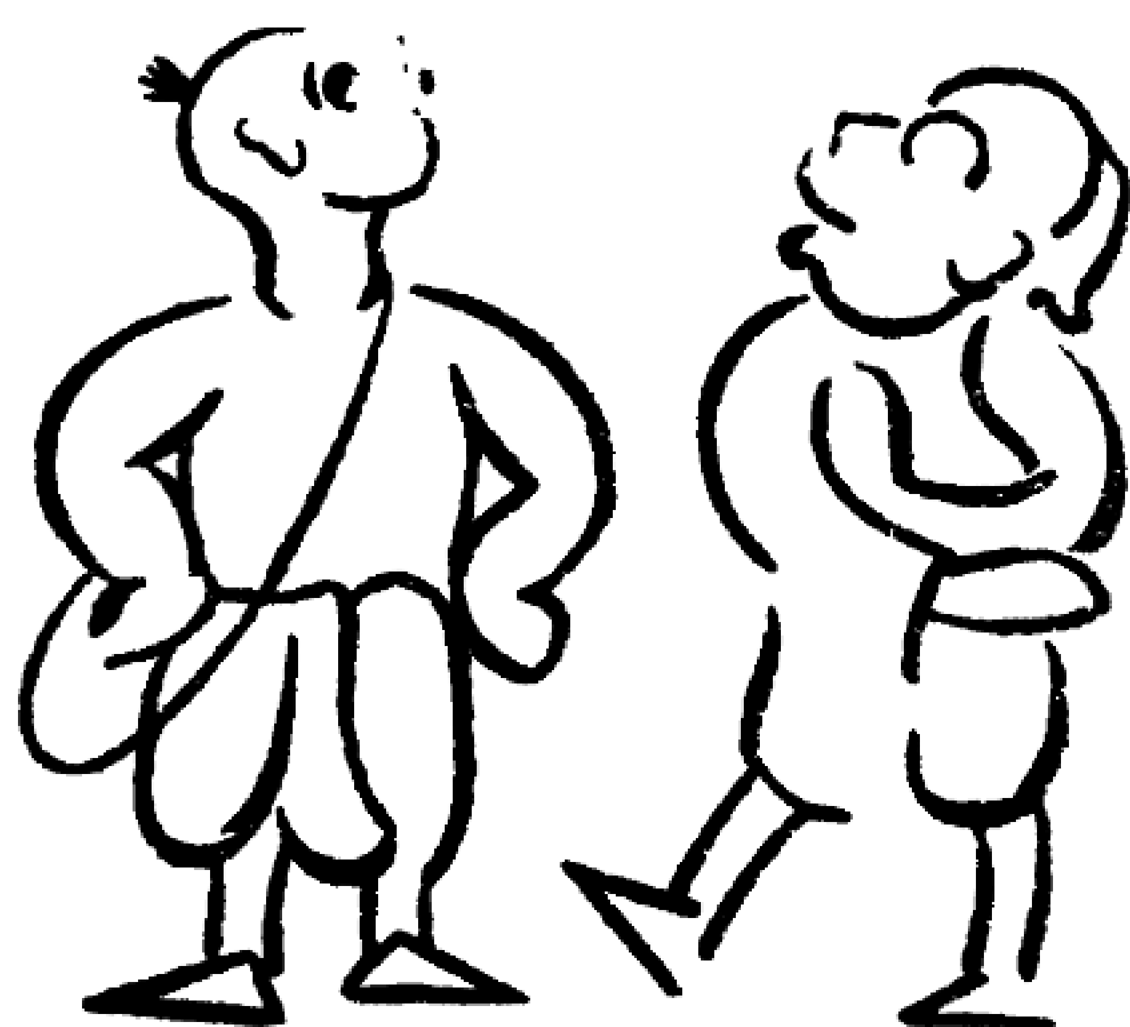
দর্শকরা তখন গান শোনা ছেড়ে সবাই কর্তার কাণ্ড-কারখানা দেখছেন—ব্যাপার কি! এদিকে সীতা যতই গণ্ডির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন কর্তা ততই ধীরে ধীরে নিজের জায়গা ছেড়ে উঠতে লাগলেন। তারপর, সীতা যেই গণ্ডি পেরিয়ে সন্ন্যাসীর ঝুলিতে ভিক্ষে দিয়েছে, অমনি সন্ন্যাসী টান-মেরে জটাজুট খুলে ফেলে রাবণের মূর্তি ধারণ করে সীতার চুলের মুঠি ধরেছে। সীতা তখন কেঁদে-কেঁদে বলছেন—"হা রাম! হা লক্ষ্মণ! আমায় রক্ষা কর।"

কর্তা তখন রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে এগিয়ে এসে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলছেন—"রক্ষে কর। কে তোকে রক্ষে করে। তখন বল্লাম হরিণ চাসনে—হরিণ চাসনে, সে-কথা শোনা হল না। এখন রাবণের বাড়ি দাসীবৃত্তি করে মরগে যা" বলেই ঠাস করে তার গালে এক চড়। ছেলেমানুষ একটি ছেলে সীতা, সেজেছিল, কর্তার হাতের সেই প্রকাণ্ড চড়-খেয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেল্ল।

কর্তা বল্লেন—"এখন কাঁদলে কি হবে! তখন যে বলেছিলুম গণ্ডি পেরুসনি!" বলেই কর্তা আর একটা চড় তুল্লেন। সীতা সেই চড়ের ওজন দেখেই রাবণের হাত থেকে চুলের মুঠি ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে যাবে, কর্তা ফস করে তার হাতে ধরে বল্লেন—"পালাবি কোথা? দাঁড়া?" বলেই বল্লেন—"রাবণ! লে যাও বেটীকে ধরে!"

কিন্তু রাবণ তখন কোথায়? সে গতিক দেখে সীতাকে ফেলে আসর ছেড়ে সাজ-ঘরে সেঁধিয়েছে। কর্তা নিজেই সীতাকে হিড়-হিড় করে টানতে-টানতে সাজ-ঘরের দিকে নিয়ে চল্লেন।

শতফুটি-সহস্রফুটি দাদাঠাকুর



সরোজকুমার রায়চৌধুরী

এক যে ছিল গ্রাম। নিতান্তই চাষার গ্রাম। কেবল একঘর বামুন। তা সে বামুনের অবস্থাও তথৈবচ। কোনও রকমে প্রথম ভাগ শেষ করে শত জায়গায় তিলক-ফোঁটা কেটে শতফুটি দাদাঠাকুর হয়ে বসেছে। গ্রামের চাষাদের ধারণা—এত বড় পণ্ডিত ও-তল্লাটে আর নেই। তাদের ক্ষেতে যা কিছু হয়, আগে দাদাঠাকুরকে না দিয়ে ঘরে তোলে না। এমনি করে দাদাঠাকুরের দিন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই চলে যায়।

অনেকদিন পরে গ্রামের চাষীরা একদিন সকালে চণ্ডী-মণ্ডপের দাওয়ায় বসে গল্প করছিল। এমন সময় দেখলে, বহু লোক ভারে ভারে নানা জিনিষ নিয়ে যাচ্ছে,—ঘড়া, ঘটি, তৈজসপত্র এবং আরও কত কি।

চাষীরা জিজ্ঞাসা করলে, কে যায়?

দলের মধ্যে থেকে একজন উত্তর দিলেন, মধ্যম গ্রামের সার্বভৌম মহাশয়। চাষীরা সসব্যস্ত দাওয়া থেকে নেমে এসে সার্বভৌম মশায়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় গিয়েছিলেন সার্বভৌম মশাই?

সার্বভৌম তাদের আশীর্বাদ করে হেসে বল্লেন, রাজ-বাড়িতে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করতে গিয়েছিলাম।

—তা এই সব জিনিসপত্র?

সার্বভৌম সবিনয়ে বললেন, তাঁকে তর্কে পরাস্ত করে এই সব পেলাম।

—তাই নাকি? তাহলে ত আজ এখানে পায়ের ধূলো দিয়ে যেতে হবে?

সার্বভৌম মশায় বিস্মিত ভাবে বললেন, কি ব্যাপার?

—আজ্ঞে, আমাদের এখানেও এক ভীষণ পণ্ডিত আছেন তাঁর সঙ্গে তর্ক করে যেতে হবে।

এখানে যে একজন বড় পণ্ডিত আছেন, সে খবর সার্বভৌম মশায় এর আগে কখনও শোনেন নি। বললেন, তা ত জানতাম না বাবা। কি তাঁর নাম?

—শতফুটি দা ঠাকুর।

এ নাম তিনি জীবনে শোনেন নি। ভাবলেন, তা হবে। হয় ত সম্প্রতি কোন বড় পণ্ডিত এখানে এসে বাস করছেন। তিনি আর আপত্তি করলেন না। বললেন, বেশ, তাই হবে।

চাষীরা বললে, শুধু হবে নয় ঠাকুর মশাই। আপনি যদি জেতেন তাহলে দাদাঠাকুরের যা আছে সব পাবেন। আর যদি হারেন, তা হ'লে যা নিয়ে যাচ্ছেন সব রেখে যেতে হবে।

সার্বভৌম মশায় তাতেও আপত্তি করলেন না। তার আর ভয় কি? অত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে যিনি হারিয়ে এসেছেন, এ অঞ্চলে তাঁকে হারাবে কে?

ভারীরা সেখানেই জিনিসপত্র সব নামালে। সে সব দেখে চাষাদের তাক লেগে গেল! কত সোনা-রূপোর বাসন, কত পাটের কাপড়, কত টাকা মোহর। জীবনে তারা এসব দেখেনি। পরম সমাদরে তারা সার্বভৌম মশায়ের জন্য চণ্ডীমণ্ডপে থাকবার যায়গা করে শতফুটি দাদা-ঠাকুরকে গেল খবর দিতে। দাদাঠাকুর সমস্ত শুনে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একবার হাসলে। জিজ্ঞেস করলে, আমার মত লম্বা চওড়া?

চাষীরা বললে, কোথায় পাবেন? আপনার আধখানা। যেমন বেঁটে, তেমনি রোগা। আর কথা কয়, যেন ছ মাস খায়নি। দেখে আমাদের ভক্তি হল না মশায়। শ্রীচৈতন্যটিও আপনার আধখানা।

দাদাঠাকুর আশ্বস্ত হয়ে আর একেবারে হাসলেন। বললেন, বেশ। পাঁচ খানা গাঁয়ে ঢোল দে। আমি বিকেলে যাব।

বিকেল হতে না হতে চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনটা একেবারে ভর্তি হয়ে

গেল। তিল ধরবার আর জায়গা রইল না। এ সময়টা চাষের কাজ নেই। কাজেই পাঁচখানা গ্রামের যত চাষী সবাই এসে জুটল।

সার্বভৌম মশায় চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় একখানা আসনের উপর চোখ বন্ধ করে যেন ধ্যানস্থ হয়ে বসে। তাঁর সামনের আসনখানি খালি রয়েছে, শতফুটি দাদাকুর তখনও আসেনি।

একটু পরে হেলতে দুলতে সে এল। মিশকালো, লম্বা-চওড়া চেহারা। তার উপর শত-স্থানের তিলক চিহ্ন যেন জ্বল জ্বল করছে। উঠোনের জনতা সসম্ভ্রমে তাকে পথ ছেড়ে দিলে।

প্রথা মত সার্বভৌম মশায়ও উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার জানালেন। ব্রাহ্মনেভ্যঃ নমঃ। কিন্তু দাদাঠাকুর নমস্কার ফিরিয়ে দিলে না, একটা কথাও কইলে না। আসনে বসেই বজ্রকণ্ঠে বললে—বলুন ত 'ফুন ফুনাফুন' ?

ফুন ফুনাফুন ? সার্বভৌম মশায় যেন বিশ বাঁও জলে পড়লেন। আকাশ-পাতাল হাতড়াতে লাগলেন, কিন্তু 'ফুন ফুনাফুন' বলে কোন শব্দ কোথাও পড়েছেন বলে মনে পড়ল না। এ জীবনে যত পুঁথি তিনি পড়েছেন সব তন্ন তন্ন করে ভাববার চেষ্টা করলেন। না, ও শব্দটি একেবারে নতুন।

শতফুটি দাদাঠাকুর আবার ধমক দিলে—বলুন।

সার্বভৌম মশায় ঘামতে লাগলেন। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। চক্ষে অন্ধকার দেখলেন। লজ্জায়, ধিক্কারে তাঁর চোখ ফেটে জল আসবার মত হল। অত বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে হারিয়ে এসে শেষে এইখানে হারতে হল! সমুদ্র পার হয়ে এসে গোষ্পদে ভরাডুবি ? কি আশ্চর্য! এত শাস্ত্র পড়েছেন, কিন্তু এমন অদ্ভুত শব্দ ত কোথাও পাননি! 'ফুন ফুনাফুন' ?

কিন্তু শতফুটি আর ভাবতে সময় দিলে না।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কিছুই না পড়ে আমার সঙ্গে এসেছে তর্ক করতে? চালাকির আর জায়গা পায়নি? এই, কে আছিস!

চাষারা হৈ হৈ করে উঠে দাঁড়াল। দাঠাকুর জিতেছে, তাদের আর পায় কে?

শতফুটি হুকুম দিলে, এর যা কিছু আছে, সব নিয়ে আমার বাড়ি তোল। আর একে গাঁ থেকে বার করে দে।

তাই হল। ঠাকুর কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চললেন। কান্নার আর দোষ কি? তাঁর ধন গেল, সম্পদ গেল, এমন কি সম্মান পর্যন্ত গেল। এরপরে গ্রামে গিয়ে মুখ দেখাবেন কি করে? সার্বভৌম মশায় কাঁদতে কাঁদতে চললেন। তাঁদের গ্রামের ধারে তাঁর ছোট ভাই তখন একটা গাছের উপর থেকে পাতা ভেঙ্গে ভেঙ্গে নীচে ফেলে দিচ্ছিল, আর গরুগুলো নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই খাচ্ছিল।

সার্বভৌমের এই ভাইটি লেখাপড়ার ধার দিয়ে যায় না। বাড়িতে চাষ-বাস ক্ষেত-খামার দেখে। দাদার উপর তার অচলা ভক্তি। গাছের থেকে দাদাকে কাঁদতে কাঁদতে আসতে দেখে সে তাড়াতাড়ি নেমে এল। ছুটে গিয়ে দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, দাদা, তুমি কাঁদছ কেন?

সার্বভৌম সেইখানে বসে পড়ে বললেন, ভাইরে, আমি চললাম। এ মুখ আর দেশে দেখাব না।

—কেন? কি হল? দিগ্বিজয়ীর কাছে হেরে এলে? তা অমন হার জিত কত হয়?

—না রে ভাই, হেরেছি বটে, কিন্তু দিগ্বিজয়ীর কাছে নয়। তাঁকে হারিয়ে ভারে ভারে জিনিস-পত্র নিয়ে আসছি, পথে এক শতফুটির পাল্লায় পড়ে...

সার্বভৌম সব কথা ভাইকে খুলে বললেন।

ভাই ত হেসেই অস্থির, বললে, কি জিজ্ঞেস করলে ? ফুন ফুনাফুন ?

—হ্যাঁ।

ভায়ের হাসি আর থামে না। বললে, ও সব তোমার শাস্তরে নেই দাদা। আমার শাস্তরের কথা তুমি জানবে কি করে ? দাও তোমার চাদরখানা।

সার্বভৌম তাড়াতাড়ি ভায়ের হাত চেপে ধরলেন। বললেন, পাগল ! আমি তার সঙ্গে পারলাম না, আর তুই গণ্ডমূর্খ, তুই যাবি !

কিন্তু ভাই কিছুতেই শুনলে না। বললে, দাও না চাদরখানা। বাড়ি গিয়ে কাউকে পাঠিয়ে দেবে। সে এসে গরুগুলো নিয়ে যাবে। দেখই না আমি কি করে আসি !

সার্বভৌম ভাইকে আটকে রাখতে পারলে না। তাঁর কাছ থেকে চাদরখানা এক রকম কেড়ে নিয়েই সে চলে গেল। দাদার অপমানে সে বেজায় চটে গেছে। পথে কোথাও থামল না, থামল একেবারে ময়না নদীর ধারে গিয়ে। এই নদীটির ধারে শতফুটির গ্রাম।

নদীর জলে নেমে বেশ করে সে হাত পা ধুয়ে ফেললে। তারপরে সারা দেহে নানা জায়গায় তিলক কেটে গ্রামের মধ্যে ঢুকল। তখন চণ্ডীমণ্ডপে সার্বভৌম মশায়ের লাঞ্ছনা নিয়ে চাষাদের মধ্যে খুব হাসাহাসি চলছিল। তিলক কাটা ব্রাহ্মণকে দেখে তারা বললে, কে যায় ?

সে বুক ফুলিয়ে উত্তর দিলে, আমি সহস্রফুটি দাদাঠাকুর।

ওরে বাবা ! ওদের দাদাঠাকুর শতফুটি, এ আবার সহস্রফুটি ! সবাই একটু দমে গেল পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বললে, কি চান ?

সহস্রফুটি জোর গলায় বললে, তোমাদের এখানে শুনেছি একজন বড় পণ্ডিত আছে। আমি তার সঙ্গে তর্ক করতে চাই।

শুনেই চাষারা হো হো করে হেসে উঠল। বললে, সে বড় সহজ পণ্ডিত নয় ঠাকুর। তুমি পালাও। এখনই এক দিগগজ পণ্ডিত তার কাছে হেরে সর্বস্বান্ত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি গেল। সহস্রফুটি সগর্বে বললে, ডাক তোমাদের দাদাঠাকুরকে। তাকে না হারিয়ে আমি ফিরছি না।

অগত্যা চাষারা গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এল। শতফুটি হেলতে দুলতে এল। এসেই জিজ্ঞাসা করলে, বল দেখি 'ফুন ফুনাফুন' ?

সহস্রফুটি প্রশ্ন শোনা মাত্র হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শতফুটির গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের প্রকাণ্ড এক চড় বসিয়ে দিলে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, বেল্লিক! ফুন ফুনাফুন? আগে টুক টুকাটুক, তারপর গুন গুনাগুন, তারপর ফুন ফুনাফুন।

প্রচণ্ড চড় খেয়ে শতফুটি তখন চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে বসে পড়েছে। তার আর কথা বলবার শক্তি নেই। সহস্রফুটি তার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিতেই যন্ত্রণায় হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে। কারণ সহস্রফুটির গায়ে ভীষণ জোর, তার চেয়ে অনেক বেশি। না কেঁদে উপায় কি ?

চাষারা সার্বভৌমের বেলায়ও কিছু বোঝেনি। এখনও তর্কের কিছু বুঝল না। কিন্তু তাদের দাদাঠাকুরকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে অঝোরে কাঁদতে দেখে তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, এবারে শতফুটির হার হয়েছে।

সহস্রফুটি ঘুরে ফিরে সকলকে বুঝিয়ে দিতে লাগল :

—এ সব তুলো-ধোনা শাস্তরের কথা। আগে তুলোগুলো টুকটুক করে বেছে নিতে হয়। তারপর জোরে জোরে গুণ গুণ করে ধুনতে হয়। ধোনা হয়ে গেলে ফুনফুন করে হালকা ঘা দিতে হয়। বেল্লিকটা সেই কথা আমাকে বোঝাতে এসেছে। ওরে বাবা! আমার কি আর শাস্তর পড়তে বাকি আছে ?

শুনে চাষারা জয়ধ্বনি করে উঠল, জয় সহস্রফুটি দাদাঠাকুরের জয়! সবাই তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। আর শতফুটিকে ঢাক বাজিয়ে গ্রাম থেকে বার করে দিলে। সার্বভৌমের কাছ থেকে যত জিনিস সে পেয়েছিল, সব তারা সহস্রফুটিকে দিয়ে দিলে। সহস্রফুটি কয়েকদিন সেখানে থেকে তারপর খুব ধুমধাম করে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি গেল।

দাদাকে গিয়ে সক কথা বলতেই তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আমারই ভুল হয়েছিল ভাই! পণ্ডিতের সঙ্গে পণ্ডিতের তর্ক হয়, মূর্খের সঙ্গে তর্কে পণ্ডিতরা পারবে কেন! ওর সঙ্গে তর্ক করতে যাওয়াই আমার অন্যায় হয়েছিল। তা বেশ হয়েছে! ওরা যখন ধরেছে, তখন তুই ওদের গাঁয়েই দাদাঠাকুর হয়ে বসবাস কর বরং। কিন্তু দেখিস, যেন আমার মত নিরীহ কোন পণ্ডিত পেয়ে তাকে ঠকাসনে।

তারপর সহস্রফুটি দাদাকে প্রণাম করে মনের আনন্দে ওদের গ্রামে বাস করতে চলে গেল।

ভাগিনেয় চরিত-কথা



গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

আমি আমার দিদির অত্যন্ত আদরের ভাই। খুব ছেলেবেলা থেকেই আমি আমার দিদি ও জামাইবাবুর কাছে মানুষ। তাঁদের কৃপাতে আমি এতটা বড় হয়েছি। তাঁদের ঋণ এ-জীবনে আর শোধ করতে পারব না।

শোধ করবার ইচ্ছে কিন্তু আমার খুবই ছিল, এবং ছিল বলেই দিদির দুই পুত্রকে কলকাতায় এনে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছিলাম। দিদির ঋণ শোধ করবার আমার আন্তরিক ইচ্ছেই ছিল এবং আপ্রাণ করেও ছিলাম সেইজন্য। প্রাণ সংশয় করেও করেছিলাম। কিন্তু যা হবার নয়, তা হবারই নয়।

ভাগ্নে দুটি যে নীরেট গবেট, তা নয়। বরঞ্চ সাধারণের চেয়ে তাদের বুদ্ধি একটু বেশিই। একটু বেশিই স্মার্ট তারা—এবং সেইখানেই আসলে গোলমাল! এই ভাগ্নেদের প্রখর বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক-সুলভ চিন্তাধারা এবং অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তি দেখে প্রায়ই তাজ্জব লাগে আমার। ছোট ভাগ্নে বাবুল, যার বয়স গোটা সাতেকের মধ্যে, ইতিমধ্যেই নানাপ্রকার গবেষণায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে যা আমি জানি না, জানা দরকার মনে করি না, অজানিত রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি এবং বেশ আরামেই নিশ্চিন্ত আছি। কিন্তু কোন ব্যাপারে জ্ঞান অসম্পূর্ণ রাখা বাবুলের মত নয়। দোতালা বাস ঘুমোয় কোথায় এবং তার বাবা কে, জাহাজে এবং ট্রেণে যুদ্ধ হলে কে জিতবে, আকাশ থেকে বৃষ্টি যে মাটিতে পড়ে, তাতে বৃষ্টির লাগে কিনা—ইত্যাদি অত্যন্ত জরুরি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা নিয়ে বাবুলের মস্তিষ্ক সব সময়েই ব্যাপৃত! এক সপ্তাহের বেশি কোন স্কুলে তাকে রাখা যায় না—স্কুলের কর্তৃপক্ষ রাখতে দেয় না।

বড় ভাগ্নে কাবুল নীরব কর্মী এবং সেই জন্যই বেশি মারাত্মক। বছর এগারো বয়স। কলকাতায় থাকার বছরখানের মধ্যে হিমালয়ের

চূড়ায় ওঠবার জন্য তিনবার, গোয়েন্দাগিরির কাজে বার চারেক এবং গুপ্তধন উদ্ধারের আশায় অসংখ্যবার গৃহত্যাগ করেছে। তার প্রতিভার সমাদর আমার সাধ্যে কুলায় না। তাই পাগলের মত কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় তাদের অনর্থক খুঁজে বেরিয়েছি, পুলিশে খবর দিয়েছি। আর হাতের আরব্ধ কার্য সমাধা করে দশ-বারো ঘণ্টার মধ্যে প্রতিবারই কর্মবীরের মত কাবুল ফিরে এসেছে।

কলকাতায় এনে ভাগ্নে দুজনকে প্রথমে পাড়ারই একটা স্কুলে ভর্তি করেছিলাম। কিন্তু স্কুলের পড়াশোনার মধ্যে আবদ্ধ থাকার মত গঠন আমার ভাগ্নেদের মস্তিষ্কের নয়। ভর্তি হয়ে ক্লাসে কাবুল একটি গুপ্তধন উদ্ধার-সমিতি খুলে বসল। স্কুলের এবং এর-তার বাড়ির দেয়াল, মেঝে, এখানে-সেখানে হাতুড়ি পিটিয়ে, খোন্তা দিয়ে খুঁড়ে দেখাই তাদের কাজ। হাবুলের প্রশ্নের পাল্লায় পড়ে, ছাত্রাবস্থায় স্কুল-পালায়নি স্কুলের এমন চারজন মাষ্টার স্কুল-পালিয়ে বেড়াতে লাগল।

স্কুলের হেডমাষ্টারের তাড়ায় ভাগ্নে দুটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু দূরে এক স্কুলে ভর্তি করলাম। কিন্তু সেইখানেই বা কদিন? এ-পাড়া সে-পাড়া করতে-করতে ভাগ্নে তাড়িয়ে চৌরঙ্গী-অঞ্চলে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে!

বাসে চড়ে স্কুলে যেতে হয় আর সেইখানেই গোলমাল। দোতলা বাসের প্রতি বাবুলের একটা আন্তরিক টান আছে। দোতলা বাস না এলে সে উঠবে না। দোতলা বাসের জন্য রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করেই অনেকদিন সে স্কুলের সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। তার জন্য বালিগঞ্জের পুরানো বাড়ি ছেড়ে দোতালা বাসের পাল্লায়—লেক অঞ্চলে আমায় উঠে আসতে হল।

কাবুলও বড় কম যায় না। একদিন এসে জানাল, শিখদের মত তাকে এবং বাবুলকে পাগড়ি কিনে দিতে হবে। তাহলে তাদেরও

শিখ-ছেলে বলে মনে হবে আর শিখ-ছেলেদের নাকি বাসে ভাড়া লাগে না।

এখানে শেষ হলেও কথা ছিল। শুধু গবেষণাতে ক্ষান্ত হবার ছেলে কাবুল নয়। একদিন দু-ভাই স্কুলে যাবার পর বিছানায় শুতে গিয়ে দেখি, চাদরখানা কে তুলে নিয়েছে। শোবার আশা ছেড়ে দিয়ে বেরোতে গিয়ে দেখি, আলনা থেকে কাপড় পাঞ্জাবি মায় গেঞ্জি পর্যন্ত সব উধাও।

কে বা কাহারা বুঝতে বাকি রইল না। ভয়ানক রেগে গেলাম। দুটি ভাগ্নেকে কলকাতায় আনার পর জীবনে শান্তি কি, ভুলে গেছি। ঠিক করলাম আর নয়। স্কুলের পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন ভুলিয়ে-ভালিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারলে হয় কোন রকমে দিদির কাছে! আজই চিঠি লিখব দিদির কাছে। ভাগ্নেদের তদারক করতে-করতে, হেড মাষ্টারদের ধমক খেয়ে-খেয়ে, দুর্ভাবনা ও অশান্তিতে আমার শরীরও ভেঙ্গে পড়েছে এই এক বছরে। চেঞ্জের দরকার। বড়দিনের ছুটিটা যদিও দিদি বলবেন তাঁর ওখানে কাটাতে কিন্তু মরলেও তাঁর ওখানে আমি থাকছি না। থাকলে ছুটির শেষে ভাগনেদের ঘাড়ে করে ফের ফিরতে হবে কলকাতায়!

একটু দেরি করে দুই শয়তান বাড়ি ফিরল বিকেলে। সঙ্গে আমার বিছানার চাদর এবং ছিন্ন ভিন্ন কাপড় পাঞ্জাবি গেঞ্জি। বাবুল কেমন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে!

কাবুলের মুখে কেমন সাফল্যের হাসি। সন্দেহ হল পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে হয় ত। জিজ্ঞেস করলাম, "পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে?"

কাবুলের হাসি ম্লান না হলেও একটু থিতিয়ে গেল। বললে, "হ্যাঁ—"

"কই দেখি রিপোর্ট—"

রিপোর্ট বার করে দেখাল কাবুল। রিপোর্ট খুব ভাল আশা না করলেও এতটা খারাপ হবে আমি ভাবিনি। বললাম, "এ কি রিপোর্ট তোমার। খুব খারাপ হয়েছে। তেইশজন ছেলে মাত্র ক্লাশে—আর তার মধ্যে তুমি তেইশ হয়েছ।"

কাবুল কিন্তু মোটেই নিরুৎসাহিত নয়। বরঞ্চ, আমাকেই উৎসাহ দিয়ে দেয় সে। বলে, "কেন মামা? আগের থেকে ত ভাল হয়েছে। আগের স্কুলে আমি ত আরও নীচে হয়েছিলাম। সেখানে হাফ-ইয়ার্লিতে ছত্রিশ জনের মধ্যে আমি ছত্রিশ হয়েছিলাম যে।"

পরীক্ষা সম্বন্ধে আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করে বিছানার চাদর নিয়ে স্কুলে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম কাবুলকে। শুনে আবার কাবুলের মুখে সাফল্যের হাসি উপচে পড়তে লাগল। বাবুল যেন আরও করুণ ভাবে তাকাতে লাগল।

কাবুল বললে, "তোমায় পাগড়ি কিনে দিতে বললাম মামা, তুমি ত দিলে না! তাই—"

"তাই কি?"

"তাই চাদরের বোঁচকা করে বাসে নিয়ে গিয়েছিলাম—"

"চাদরের বোঁচকা কেন?" আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারি না।

"ছ পয়সা ভাড়া বেঁচে গেল। বাবু—"

"ছ পয়সা ভাড়া বেঁচে গেল!" আমি তখনও যে তিমিরে সেই তিমিরেই।

"হ্যাঁ, মামা। বাবুর যাবার ভাড়া। আসবার সময়ও আবার ছ পয়সা বাঁচালাম বাবুর।"

"আবার ছ পয়সা।" সমস্তই গোলমাল ঠেকতে লাগল আমার কাছে।

"হ্যাঁ, মামা। আর আমারও ছ পয়সা। মাত্র কালিঘাট অবধি টিকিট করেছিলাম যে, প্রায় সবটা চলেও এসেছিলাম—পাজি

বাসওয়ালার জন্য পারলাম না। মোড় ঘুরতেই 'চার পয়সা টিকিট উতরো' বলে বোঁচকাটা ছুঁড়ে নামিয়ে দিল। বাবুর পা মচকে গেছে দেখ না!"

বাবুল খোঁড়াচ্ছে, আগেই লক্ষ্য করেছি। জিজ্ঞেস করলাম, "কি করে মচকাল?"

কাবুল আমার বোকামিতে অবাক হয়ে গেল যেন! বলল, "বাবু যে ঐ বোঁচকাতেই ছিল!"

কি সর্বনাশ! ভাগ্নে নয় ত খুনে। এতক্ষণ পরে কাবুলের হেঁয়ালি কথাবার্তার অর্থ পরিষ্কার হল। বাবুলের করুণ দৃষ্টির মানে বুঝতে পারলাম এতক্ষণে! আর এও বুঝতে পারলাম যে, আমি নিজেও খুব নিরাপদ নই। ঘুমের ঘোরে এরা আমাকে খুনও করে রেখে দিতে পারে। তাছাড়া এক মুহূর্ত নষ্ট না করে, অবিলম্বেই যদি দিদির গচ্ছিত এই অমূল্য রত্ন দুটি দিদিকে না ফেরৎ দেই—তাহলে পরে হয় ত ফেরৎ দেবার সুযোগ আর পাব না। ছেলে দুটিকে এনেছিলাম মানুষ করবার জন্য। মানুষ করতে না পারি, অন্তত জেলে বা খোয়া যাবার আগে দিদির হাতে তাদের পৌঁছে দেওয়া আমার কর্তব্য। আর আমার কেমন যেন মনে হতে লাগল যে, আজ রাত্রে এখনি আমার রওনা হওয়া উচিত। ভয় হতে লাগল আজ রাত পেরোলে হয় ত ভাগ্নে দুটিকে আস্ত আর ফেরত দিতে পারব না।

মার কাছে যেতে বাবুলের উৎসাহ থাকলেও কাবুল সরাসরি আপত্তি জানাল। তার বিশেষ কি কাজ আছে। কিন্তু আমি তখন মন ঠিক করে ফেলেছি। আর ওজর আপত্তি শোনবার মত ধৈর্যও আমার নেই। সঙ্গে সঙ্গে জিনিষ-পত্তর আর বাবুল কাবুলকে গুছিয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। ট্যাকসি ডাকতে বলতেই বাবুল বললে, "দোতলা বাসে করে গেলে হয় না, মামা?"

কাবুল জানালে, "হ্যাঁ, মামা, বাবুকে বোঁচকা করে—"

বাবুল কেমন মিইয়ে গেল বোঁচকার কথা শুনে। আমি ধমক দিলাম দুজনকেই।

ট্রেনে চেপেই কি শান্তি আছে। বাবুলের গবেষণার ধাক্কায় কাহিল হয়ে পড়লাম। আমার মেজাজ চড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বাবুলের গবেষণাও ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করল। আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম—ভয়ানক ধমকে দিলাম।

সহযাত্রী ঝাঝা-গামী এক ভদ্রলোক বাবুলকে স্নেহভরে ডেকে নিলেন। কাবুল দরজার পাশে বসে বিরসবদনে বাইরের অন্ধকার দেখছিল। মনে হল, যাক—ট্রেনে যখন উঠেছি দুজনকে নিয়ে, ট্রেন যখন আবার চলতে সুরু করেছে; আর কাল সকালেই যখন ঝাঝায় দিদির কাছে এ দুটিকে সমর্পণ করতে পারব, তখন শান্তি এবং মোক্ষ আমার কাছ থেকে বেশি দূরে নেই। কিন্তু সেটা যে কত বড় ভুল ধারণা!

ট্রেনের দোলায় ঘুম এসে গিয়েছিল। ঘণ্টা-দুয়েক বাদে ট্রেনের ঝাঁকানিতেই ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি, চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বাবুল বসে আছে। সেই ভদ্রলোক অন্তর্হিত। জিজ্ঞাসা করলাম বাবুলকে, "সেই ভদ্রলোক কোথায়?"

"নেমে গেছে—" বললে বাবুল, "লোকটা কিচ্ছু জানে না। যা-যা জিজ্ঞেস করি, কিছুই বলতে পারে না মামা। যখন জিজ্ঞেস করলাম, এরোপ্লেনের ডিম কত বড় হয়? লোকটা উত্তর না দিয়ে নেমে গেল। তুমি জান মামা এরোপ্লেনের ডিম কত বড় হয়?"

প্রশ্ন শুনে আমার পিলে চমকে উঠল এবং প্রচণ্ড ধাক্কা মারল হার্টে। হার্টফেল করতে-করতে সে যাত্রা জোর বেঁচে গেলাম। ভদ্রলোকের জন্য দুঃখ হল। আমারই অন্যায় হয়েছে। ভদ্রলোকের উপর বাবুলকে অমন করে লেলিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। অন্তত, সাবধান করে দেওয়া

কর্তব্য ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম বাবুলকে, "কোথায় নেমে গেলেন রে? কোন স্টেশনে?"

বাবুল নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে, "দাদার আগের স্টেশনে—"

দাদার আগের স্টেশনে! শুনে লাফিয়ে উঠলাম। শুধু ভদ্রলোকই নয়, দরজার কাছ থেকে কাবুলও হাওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কাবুল কোন স্টেশনে নামল?"

"সেই লোকটার পরের স্টেশনে—"

"সেই লোকটা কোন স্টেশনে নামল?"

"দাদার আগের স্টেশনে—"

নিশ্চিন্ত হলাম। দিদির ঋণ এ-জীবনে আর আমার শোধ করা হল না। বরঞ্চ এক ভাগ্নে পরিমাণ, বেড়েই গেল!

অবিশ্যি, তখনও করবার আমার অনেক কিছুই ছিল। বাবুলকে ঠ্যাঙানো থেকে ট্রেনের চেন-টানা অবধি। ট্রেনের চেন-টানা থেকে থানা, পুলিশ, রেলে চড়ে ঘুরে বেড়ানো—ম্যায় খবরের কাগজে 'কাবুল ফিরে আয় বিজ্ঞাপন পর্যন্ত। কিন্তু অত হাঙ্গামায়, অত পরিশ্রমে আমার উৎসাহ নেই। এক বছরের উপর রোদে ভিজে এবং জলে পুড়ে ভাগ্নেদের পিছন-পিছন দৌড়-ঝাঁপ এবং কুস্তি লড়ে আমার দেহেরই বা আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে।

তিন মূর্তি



শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

একটা ভারি মজার গল্প বলি শোনো।

নেই-গ্রামের নাম শুনেছ?

এ হল গিয়ে সেই নেই-গ্রামের গল্প।

মস্ত বড় গ্রাম। গ্রামে কত রকমের কত লোক। তাদের মধ্যে মাত্র তিনজনের কথা বলব। তিনজনেই ভগবানের সৃষ্টি—অতি অদ্ভুত জীব।

একজন দিবারাত্রি শুধু চোখ পিট পিট করে, চোখের পাতায় তার কি যে হয়েছে কে জানে। এক মুহূর্ত সে চোখ না কচলে থাকতে পারে না। হরদম দেখা যায়, হাত দিয়ে সে চোখ কচলাচ্ছে।

আর একজনের সর্বাঙ্গে দাদ। কত রকমের কত ওষুধ সে ব্যবহার করেছে কিন্তু দাদ কিছুতেই সারেনি। চব্বিশ ঘণ্টা তাকে দাদ চুলকোতে হয়।

আর একজনের মাথা-ভরা টাক। মাথায় তার চুলের নাম-গন্ধ নেই।

গ্রীষ্মকালটাকে এদের ভারি ভয়। মাথার ওপর সূর্য ওঠে, রোদ্দুরে, চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে, টেকোর টাক যায় জ্বলে, ঘন-ঘন মাথায় জল দিতে হয়। এদিকে রোদ্দুর লাগলেই দেদোর দাদ পিট পিট করে চুলকে চুলকে হায়রাণ হয়ে ওঠে। চোখের পাতার ব্যারাম যার, তার ত কথাই নেই। চোখে রোদ লাগতেই চোখ দুটো সে কচলাতে আরম্ভ করে, দেখে মনে হয় চোখ দুটো যেন সে উপড়ে ফেলতে পারলে বাঁচে!

কাজেই রোদ্দুরে বড় একটা তারা বেরোয় না।

অথচ মিথ্যা কথা বলতে তিনজনেই ওস্তাদ!

যে-লোকটা চোখ পিটপিট করে, তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা

য়—'হ্যাঁ হে, চোখে তোমার কোনও ব্যারাম-ট্যারাম হয়েছে নাকি ?'

তৎক্ষণাৎ বলবে, 'কই না! কিচ্ছু ত হয়নি। ও এমনি।'

সর্বাঙ্গে যার দাদ, তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, 'ও কিছু না। কিছুদিন আগে একটুখানি চুলকুনি হয়েছিল, কবে সেরে গেছে।'

গ্রামের একজন লোক একদিন জিজ্ঞাসা করলে, 'না চুলকে তোমরা থাকতে পার ?'

দেদো বললে, 'নিশ্চয়ই পারি।'

চোখে যার ব্যারাম সেও বললে, 'আমিও পারি।'

মাথায় যার টাক, তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, সে বললে, 'টাক নেই কার বলুন ত ? আজকাল অনেকেরই দেখবেন মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। টাক থাকলে টাকা হয়।'

লোকটা বললে, 'তা বলিনি। দুপুরের রোদ্দুরে তোমার কষ্ট হয় কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

টেকো অম্লান বদনে বলে বসল, 'কষ্ট কেন হবে? কোনও কষ্টই হয় না।'

তাদের এই মিথ্যা কথা শুনে লোকটার ভারি রাগ হল। বললে 'দাঁড়াও, তোমাদের একদিন আমি পরীক্ষা করব।'

চোখ, দাদ আর টাক—তিনজনেই বলে উঠল, 'শুধু শুধু পরীক্ষা করলে ত চলবে না দাদা, বাজি রাখো। আমরা প্রমাণ করে দেব —রোদ্দুরে আমাদের কোনও কষ্টই হয় না।'

'আচ্ছা রাখলুম বাজি!' বলে সে একটা ভারি মজার ফন্দী করলে। বৈশাখ মাস। দুপুরের রোদ্দুর একেবারে আগুন বললেই হয়। বললে, তোরা তিনজনেই আয় আমার সঙ্গে। মিছে কথা বলা তোদের বের করছি।'

এই বলে গ্রামের পাশে যে নদীটা ছিল সেইখানে তাদের নিয়ে যাওয়া হল।

বললে, 'ঘণ্টাখানেক ধরে নৌকোয় চড়ে আমরা এই নদীর ওপর ঘুরে বেড়াব। তোমরা তিনজনে যদি চুপ করে বসে থাকতে পার ত তোমাদের আমি পুরস্কার দেব পাঁচ টাকা!'

মাথার ওপর রোদ্দুর তখন ঝাঁ ঝাঁ করছে। তিনজনেই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে, চোখ পিট পিট যে করত সে একবার জিজ্ঞাসা করলে, 'গল্প করতে পাব ত?'

'হ্যাঁ, তা পাবে।'

'ব্যস, তবে আর-কি, চলে এস! পাঁচটা টাকা বলে কথা।'

এই বলে আগেই সে নৌকোয় চড়ে বসল।

তার দেখাদেখি শ্রীদুর্গা বলে দেদোও উঠল, টেকোও উঠল।

লোকটা নৌকো দিলে ছেড়ে!

খানিক যেতে না যেতেই খালি গায়ে রোদের তাত লেগে দেদোর দাদ উঠল চিড়বিড় করে। চোখ যে চুলকোয় তার তখন হয়ে এসেছে। আর টাকের ত কথাই নেই। প্রতিমুহূর্তেই তার মনে হতে লাগল—মাথার খুলিটা বুঝি ফেটে গেল!

সর্বনাশ!

সবাই ভাবছে, মিথ্যে কথাটা না বললেই হত। কাজ নেই বাবা পাঁচটা টাকায়। তার চেয়ে একবার চুলকে নিয়ে বাঁচি।

টেকো একদৃষ্টে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল—দেবে নাকি ঝাঁপিয়ে? মাথাটা তবু ঠাণ্ডা হবে।

যাক, গল্পে যখন বাধা নেই, যে-লোকটার চোখ চুলকোনো রোগ,

স তখন গল্প আরম্ভ করলে। খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে সময়টা তবু াটবে ভাল।

সে বলতে লাগল :

'ছাখ ভাই, আমার মামার একটা ভেড়া ছিল, বুঝলি? ওরে বাবা, স কী ভেড়া! তার শিং দুটো কি রকম ছিল জানিস? এই —এমনি!'

বলেই সে তার দুটো হাত দিয়ে দেখাতে লাগল;

'এই মাথার ওপর থেকে বেরিয়ে, চোখ বরাবর ঘুরে এমনি করে পাক দিয়ে দিয়ে, এমনি করে পাক দিয়ে দিয়ে—ঘুরে ঘুরে এই এমনি বুঝলি?'

পাক দেওয়া-দেওয়া ভেড়ার শিং দেখাতে গিয়ে—নিলে ব্যাটা চোখদুটো আচ্ছা করে কচলে!

দেদো তখন অস্থির হয়ে উঠেছে। ব্যাটা ত নিলে কাজটা কোন রকমে সেরে। এখন আমি করি কি!

দেদো যন্ত্রণায় আর কিছুতেই থাকতে না পেরে বলে উঠল :

'আরে রেখে দে তোর মামার ভেড়া! আমার এক দাদা ছিল, বুঝলি? সে যখন এমনি করে তাল ঠুকে সারা গায়ে এমনি করে— বুঝলি? এমনি করে মাটি মেখে, এমনি করে রগড়ে রগড়ে মাটি মেখে বুক ফুলিয়ে গিয়ে দাঁড়াত তখন কার বাবার সাধ্যি তার কাছে এগোয়! বুঝলি?'

টেকো একধারে চুপটি করে বসে ছিল। ম্লান মুখে সে শুধু বললে, 'বুঝলুম।'

কিন্তু হে ভগবান মাথা যে গেল! এখন তার কি উপায় হবে?

সে তখন কি আর করে, বললে, 'ছাখ ভাই, আমার মামাও নেই, তোমার দাদাও নেই—'

বলেই সে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নদী থেকে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে তার টেকো মাথায় দিয়ে বললে, 'এই তোর মামার চরণে পেন্নাম!' আর এক অঞ্জলি নিয়ে বললে,

'এই তোর দাদার চরণেও পেন্নাম!'

বাজি রেখে যে নৌকো চালাচ্ছিল এদের কাণ্ড দেখে সে ত অবাক!

সু—শিক্ষা



বুদ্ধদেব বসু

সেদিন রঞ্জুকে একটা চড় মেরেছিলাম বলে বুলু-দি আমাকে কী বকুনিই বকলেন! আমরা কারু উপর রাগ করলে পাজি গাধা শুয়োর যার যা খুশি তা-ই বলি তো—বুলু-দির বকুনি মোটেও সে-রকম না, কটমট ইংরিজির ভাষায় লম্বা-চওড়া সাফ বক্তৃতা একটি, যেন মাথার উপর আস্ত একখানা ডিকশনারি উপুড় করে ঢেলে দিলে কেউ। আধেক কথার মানেই বোঝা যায় না। না-বুঝলেও মানে লাগে বই কি। আমি—শ্রীসমীরণ তালুকদার—এই সেদিন মাত্র পুরো একটা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে উঠলাম, দুদিন বাদে কলেজে পড়ব। আমাকে কিনা অমন করে বলা! যা রাগ হল মনে-মনে! অথচ কিছু বলবার জো নেই, দশ বচ্ছর জয়পুরে কাটিয়ে বুলু-দি এই সেদিন মাত্র কলকাতায় এসেছেন—তাঁকে নিয়ে বাড়িতে হুলুস্থুল, আজ তাঁর অনারেই আমাদের বাড়িতে ভোজ—সাধ্য কী তাঁকে কেউ কিছু বলে! পিসিমা বিধবা মানুষ, বুলু-দি তাঁর একমাত্র মেয়ে, তিনি যে একটু বেশি মাতামাতি করবেন তা বুঝি, কিন্তু আমার মা-ও যেন ক্ষেপে গেছেন, কদিন ধরে বুলু ছাড়া তাঁর মুখে আর কথাই নেই। একবার বিয়ে হয়ে গেলে এই দিদি-টিদিগুলো আর মানুষ থাকে না—দেমাকে পা পড়ে না মাটিতে, রীতিমত বড়-বড় ছেলেদেরও কচি খোকার মত জ্ঞান করে—এদিকে মা মাসি পিসি বাবা কাকা মামা ইত্যাদি যে যেখানে আছে সবাই আদর দিয়ে দিয়ে তাদের আর কিছু রাখে না। দুচক্ষে দেখতে পারিনে এই বিয়ে-হওয়া-দিদিদের।

হয়েছিল কী—খাওয়ার পরে শুয়ে-শুয়ে একটা অ্যাডভেঞ্চারের নভেল পড়ছি—[illegible] কোত্থেকে একটা পাখির পালক নিয়ে এসে আমার কানে সুড়সুড়ি [illegible] লাগল। কানে পালকের সুড়সুড়ি এমনিতে মন্দ লাগে না, [illegible] তখন, মনে করো, অমরকে নরখাদকেরা [illegible]

ফেলেছে, কিছুতেই পালাবার উপায় নেই, অথচ সে ত পালাবেই (বইয়ের শেষ পাতাটা আগেই উঁকি দিয়ে দেখে নিয়েছি—এখন তার কলকাতার বাড়ির বারান্দায় বসে চা খাচ্ছে—তাছাড়া অ্যাডভেঞ্চারের নভেলে নায়ক যত বিপদেই পড়ুক, কখনও সে মরবে না এ ত জানাই জানা) —এমন সময়ে কি কানে সুড়সুড়ি ভাল লাগে? আমি গম্ভীরভাবে একবার বললুম, 'উহুঁ!' কিন্তু রঞ্জু আমার নিষেধ অমান্য করে আবার সুড়সুড়ি দিলে। তখন বেশ একটু বিরক্ত হয়েই আমি বললুম, 'আ—হা!' কথাটার রঞ্জু কী মানে বুঝল জানি না, কিন্তু তারপরেই দেখি পালকটা সে আমার নাকের ভিতর ঢোকাবার চেষ্টা করছে। তখনই ত তাকে দিলুম এক চড়—হাবাটা ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। তাও ত আস্তেই মেরেছিলাম—কক্ষনও বেশি লাগে নি ওর—রঞ্জুটার ঐরকমই ন্যাকা স্বভাব। আর যদি লেগেও থাকে আমিই ত ওকে হ্যাপি বয় কিনে খাওয়াতুম, চুকে-বুকে যেত। মাঝখান থেকে বুলু-দির ফোঁপর-দালালি কেন?

বুলু-দি বললেন, ছোটদের কক্ষনও মারতে নেই, দোষ করলেও না, গুরুতর অপরাধ করলেও না, এমন কি বকতে নেই পর্যন্ত, সব সময় আদর করে, মিষ্টি কথা বলে তাদের শিক্ষা দিতে হয়, অন্যায় থেকে নিরস্ত করতে হয়, নয়ত ভবিষ্যতে তারা কিছুতেই সুস্থ স্বাভাবিক সুসম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। আমরা যাকে দুষ্টুমি বলি সেটা ওদের খেলা, আর খেলাই ওদের কাজ, তাই ওদের দুষ্টুমিতে কক্ষনও বাধা দিতে নেই, দুষ্টুমির বেগটাকে ভালো-ভালো দিকে বইয়ে দিতে হয়। একেই বলে সুশিক্ষা। এ বিষয়ে পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিকেরা একমত যে—

বুলু-দি প্রায় দশ মিনিট ধরে একটানা বললেন, ... মা, পিসিমা,

…বৌদি, ছোড়দি সব হাঁ হয়ে শুনল। আর আমি? রাগে আমার গা-পিটপিট—করতে লাগল, তক্ষুনি উঠে গনগনে রোদ্দুরে চলে গেলুম টুটুদের বাড়ি।

তাও ত ভাগ্যিস জামাইবাবু আসেন নি। শুনেছি তিনি মেটরলজিষ্ট না ঘটরলজিষ্ট, না মাথা-মুণ্ডু কী, খুব রাশভারি মানুষ দারুণ বিদ্বান। আরও বড় একটা চাকরি নিয়ে জয়পুর থেকে কলকাতায় আসছেন—এখনও এসে পৌছতে পারেননি। বুলু-দি আগে এসে বাড়ি-ঘর-দোর সাজাবেন, তারপর মহাপুরুষটি আসবেন। এরকম একটা রোখা-চোখা দিদি আর কটমটে জামাইবাবুকে নিয়ে আমার জীবনে কি সুখ বাড়বে আমি ত ভেবে পেলুম না।

বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে দেখি, বুলু-দি যাচ্ছেন। বাড়ি শুদ্ধ লোক ট্যাক্সির ধারে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে, যেন লাট সাহেবকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে। মা বললেন, 'কুলু ভলুকে ত আনলি না আজ—'

'না, মাসিমা, ওরা ভীষণ নিয়মে থাকে—একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ওদের খাওয়া-শোওয়া—কোনও অনিয়ম ওদের সয় না।'

'আর-একদিন সুবিধে মত নিয়ে আসিস।'

'আনব, কিন্তু কিছু খাওয়াতে পারবে না। যা তেল-মশলা তোমাদের রান্নায়!'

কথাটা শুনে আমার মাথার ভিতরটা চিড়িক করে উঠল। অথচ মা দেখি দিব্যি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছেন। মা-রা যে কী!

বুলু-দি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে তুমি এসেছ। রোদ্দুরে এত ঘোরাঘুরি কর কেন? মা দিদিরা ঠিক কথাই বলে—তাতে [illegible] করতে নেই। একদিন যেও আমাদের বাড়ি—কেমন?'

আমি গোঁজ হয়ে মুখ ফিরিয়ে রইলুম। ট্যাক্সি রওনা হল।

এটা প্রায় এক মাস আগেকার কথা। ইতিমধ্যে ফুটবলের সীজন আরম্ভ হয়েছে, বুলু-দির কথা ভুলেই গেছি। এখন কালকের কথা শোনো।

কাল হল কী—মাঠে তেমন জোরালো কোন খেলা ছিল না। ভাবছিলাম, সিনেমাতেই যাব, না মন্টুদের সঙ্গে দল বেঁধে পার্কে বসেই বিকেলটা কাটিয়ে দেব—এমন সময় মা এসে বললেন, 'বুলু সেদিন একখানা শাড়ি ফেলে গেছে—দিয়ে আয় ত।'

আমি বললাম, 'বুলু কে?'

মা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন, 'আহা—কথা শোন ছেলের! বুলু—আমাদের বুলু—তোর বুলু-দি।' মা-র গলার আওয়াজে ভালবাসা যেন ঝরে পড়ল।

'উহুঁ, পারব না।'

'পারবি না কি রে?—এমনি ত টো-টোর উপরেই আছিস, আর এইটুকু একটা কাজও তোকে দিয়ে হবে না। কী হচ্ছিস তোরা দিন দিন!'

আমি বললাম, 'ভাল লাগে না আমার বুলু-দিকে।'

মা একটু হেসে বললেন, 'ঐ ত একদিন একটু দেখেছিস—এর মধ্যে আবার ভাল-লাগা মন্দ-লাগার কথা কী হল! বুলু চমৎকার মেয়ে—আর ধীরেনের মত ছেলে ত হয়ই না—তুই যা, গেলেই তোর ভাল লাগবে। ওরা নতুন এসেছে কলকাতায়—এমনিও ত মাঝে-মাঝে তোর যাওয়া উচিত।'

মা-র পেড়াপিড়িতে রাজি হয়ে গেলুম আমি। ঐ আমার একটা মস্ত দোষ—মা কিছু বললে না-না করতে-করতেও সেটা করে ফেলি।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরে পাকা বাবুটি সেজে গেলুম ত বুলু-দির বাড়ি। ল্যান্সডাউন রোডের সাহেবি অংশে ফ্ল্যাট নিয়েছেন তাঁরা। কার্পেট-পাতা মস্ত ড্রয়িংরুম, কত রকম আসবাব—দরজার-দরজায় ভারি পরদা, তোমার ছিরিছিরি বাড়ি বলে তুমি যে হুস করে ভিতরে ঢুকে যাবে তা স্বপ্নেও ভেব না। কী করব ভাবছি, এমন সময় পাগড়ি-পরা বেয়ারা এসে কেমন একটু ট্যারচা চোখে আমার দিকে তাকাল। ভাগ্যিস আমার মনে পড়ে গেল যে যাদের বাড়িতে ড্রয়িংরুম থাকে তাদের সাহেব-মেমসাহেব বলতে হয়—তাই ত আমি চট করে বললুম, 'মেমসাবকে খবর দাও। বল যে বালিগঞ্জ থেকে তাঁর ভাই এসেছে।'

বেয়ারা পাখা খুলে দিয়ে চলে গেল। আমি বসলুম।

একটু পরে মোটা-সোটা ফর্সা চেহারার দুটি ছেলে এল—দেখেই বোঝা যায় জন্ম থেকে দুধ ছানা ক্ষীর মাখন আর নানারকম ফল-টল খেয়ে মানুষ। তাদের পিছনে এলেন জামাইবাবু, বেঁটেখাটো গোলগাল ভালমানুষটির মত দেখতে—আর সর্বশেষে এলেন বুলু-দি। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম—'মা আমাকে এই শাড়িখানা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন—'

'বেশ, বেশ, বোসো। কলু ভলু—এই যে তোমাদের এক মামা। আলাপ কর।'

কলু বললে, 'মামা! কী মজা!'

ভলু বললে, 'আর কোনদিন আমরা মামা দেখিনি।'

আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালে দুজনে। আমার একটু ভালই লাগল—বাঃ, ছেলে দুটি ভারি খাসা ত—এর আগে কোনদিন আমাকে দেখেনি, অথচ কী রকম আলাপী! তাছাড়া মামা হবার একটা গৌরবও তা আছে। ওদের মাথায় হাত রেখে একটু আদর

করতে যাচ্ছি, হঠাৎ কলু শাঁ করে আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, 'দেখি কী আছে তোমার পকেটে।'

ওধার থেকে বুলু-দি বললেন, 'কলু, ও-রকম করতে নেই।' 'ভাল হয়ে বোসো—ভাল হয়ে আলাপ কর মামার সঙ্গে।'

ডলু ততক্ষণে আমার বুক-পকেট থেকে ফাউণ্টেনপেনটি তুলে নিয়েছে। 'কী কলম এটা? পার্কার না শেফার? পেলিকান না ওয়াটারম্যান?'

আমি হেসে বললুম, 'হল না। এটা এভারশার্প।'

'এভারশার্প। দেখি, দেখি!' ডলুর হাত থেকে কলু ছিনিয়ে নিলে কলমটা, তারপর কলুর হাত থেকে ডলু। ঝপ করে ক্যাপ্ খুলে ফেলে বললে, 'ওমা, কালি ভরে কোনখান দিয়ে?'

'দাও আমাকে, দেখিয়ে দিচ্ছি,—আমি হাত বাড়ালুম।

'থাক, থাক, আমি পারব—ও, বুঝেছি!' ডলু পিছনের স্প্রিং ঘোরাতে লাগল। আমি মনে মনে ওদের হাত থেকে কলমটি উদ্ধার করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, অথচ কী উপায়ে ভদ্রভাবে তা করা যায়, ভেবে পেলাম না।

এধার থেকে জামাইবাবু বললেন, 'ওদের তুজনেরই কলকব্জায় খুব মাথা। কোন-একটা জিনিষ হাতে পেলে তার একেবারে ভিতরটা খুলে না দেখা পর্যন্ত ওদের স্বস্তি নেই।'

'ছেলেবেলায়,—ওধার থেকে বললেন বুলু-দি, 'যত পুতুল ওদের এনে দিয়েছি, তক্ষুনি পেট চিরে মাথা ভেঙে হাত-পা ছিঁড়ে এমন করেছে যে দেখে মনে হয়েছে কোনও এক্সপেরিমেণ্ট চলছে ল্যাবরেটরিতে।'

'খুব মাথা ওদের'—মাথা নেড়ে বললেন জামাইবাবু, 'বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক হবে তুজনেই।'

'থাক, থাক'—বুলু-দি একটু হাসলেন, 'হবে যখন হবে। এখন

থেকেই ওদের মাথায় ও-সব ঢুকিয়ে দিয়ে কাজ নেই। কলু, ডলু, কলমটি ভাল করে দেখা হলে মামাকে ফিরিয়ে দাও—মামাকে বিরক্ত কোর না।'

ঐ একটুখানি একটা কলমের মধ্যে ওদের মত মাথা-ওলা ছেলে কত আর রস পাবে—ওটা রেখে দিয়ে মামা নামক জীবন্ত বস্তুটাকেই আক্রমণ করলে ওরা। চুল ধরে টানা, কাঁধে চড়া কানে ফুঁ দেয়া, হাতে-পায়ে সুড়সুড়ি দেয়া—সবই একে-একে হতে লাগল। আমার ধবধবে ইস্ত্রি-করা পাঞ্জাবিটা ন্যাতার মত হয়ে গেল, চুল এসে পড়ল কপালে, মাথার শির দপদপ করতে লাগল, ভিতরের গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে গেল। বুলু-দি আর জামাইবাবু মুচকি হেসে-হেসে বার বার চোখাচোখি করতে লাগলেন। অবশেষে বুলু-দি বললেন, 'মামাকে পেয়ে কিরকম আনন্দ হয়েছে ওদের! অনেকে আছে, ছেলেপুলে কাছে এলেই খেঁকিয়ে ওঠে। সেটা ঠিক না। ওদের ভাল-লাগার এটাই ত প্রকাশ। কিন্তু আর না। কলু, ডলু, এবার তোমরা চুপ করে, শান্ত হয়ে, বেশ ভদ্রভাবে বোস ত। কিছু খাবে, সমি?'

কলু বলে উঠল, 'ক্যাঁচকলা খাবে!'

'আরশোলা খাবে!' বললে ডলু।

'ক্যাঁচকলা!' চেঁচিয়ে বললে কলু।

'আরশোলা!' আরও চেঁচিয়ে ডলু।

'ছিঃ!' ওধার থেকে ধীর মধুর স্বরে বুলুদি বললেন। ও-রকম করা ভাল না। ও-রকম যারা করে কেউ তাদের ভালবাসে না। কলু, ডলু, শান্ত হও, চুপ করে বোসো।'

এতক্ষণে আমার কী রকম লাগছে তাও কি বুঝিয়ে বলতে হবে? ছেলে দুটোকে একের পর এক ঘাড় ধরে তুলে বেড়াল-

বাচ্চার মত জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে না-দিয়ে কেমন করে ছিলাম, আজ সে-কথা ভেবে অবাকই লাগছে।

বুলু-দি আবার বললেন, 'কলু, ডলু, লক্ষ্মী ছেলে, চেঁচিও না, চুপ করো।'

অবাক কাণ্ড! এ-কথার পরেই ওরা চুপ করে গেল, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঘাড়ের তলায় এক চিমটি। আমি 'উঃ' বলে যেই পিছনে তাকিয়েছি, অমনি চিমটিটা সরে এল আমার কব্জির উপর। এবার আমি বলে উঠলুম, 'ও কী! চিমটি কাটছ কেন?'

আমার কথা শুনে কলু-ডলু হেসে কুটিপাটি।

'ছি ছি ছি, মামাকে বুঝি চিমটি কাটতে আছে!' বুলু-দি বললেন।

'লক্ষ্মী ছেলে চিমটি কাটে না।' বললেন জামাইবাবু।

তক্ষুনি আমার দু কানের পিছনে একসঙ্গে দুটো চিমটি।

বুলু-দি বললেন, 'কলু ডলু, শোনো, এ-ঘর থেকে চলে যাও।'

জামাইবাবু বললেন, 'তোমাদের খাবার সময় হল—'

'যাও, ডলু। কলু, যাও।'

'কেউ ভাল বলবে না তোমাদের।'

'তোমার মা-বাবার নিন্দে হবে।'

'চিমটি কাটতে ভাল লাগে, কিন্তু খেতে ভাল লাগে না, তা ত জান।'

'তোমাদের কেউ চিমটি কাটলে কেমন লাগে তোমাদের?'

এত ভাল-ভাল উপদেশের পরে কলু-ডলু যে জোড়া চিমটি কাটল তাতে আমার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেল।

তখন জামাইবাবু বললেন, 'কী মুশকিল, চিমটি কাটতে

ওদের বড্ড ভাল লাগছে, দেখছি। আচ্ছা, এক কাজ কর —আর একটি কাটো, একটি মাত্র, কলু একটি, ডলু একটি, তারপর আর না। তারপরেই এখান থেকে চলে যাবে কিন্তু।'

কিন্তু কাকে চিমটি কাটবে? হঠাৎ দেখি, আমার পায়ের দুপাটি চটি উঠে এসেছে দুহাতে, আর সপাসপ পড়ছে কলু-ডলুর পিঠে।

আজ দেখছি বুলু-দি রাগ করে প্রকাণ্ড লম্বা চিঠি লিখেছেন মা-কে, তাতে কত শক্ত-শক্ত কথা, কত বই থেকে কোটেশন। তার জবাব লিখলাম আমি। একটি লাইন শুধু।

'বুলু-দি, তোমার কথাই ঠিক, এর নামই সুশিক্ষা, কিংবা shoe-শিক্ষা।'

আশা করি এর পরে বুলু-দির সঙ্গে আমাদের বাড়ির আর সম্পর্ক থাকবে না। বাঁচা গেল।

নটবরের কারসাজি



লীলা মজুমদার

সেই ছেলেটা প্রথম যেদিন মাষ্টারমশায়ের পেছন পেছন ক্লাশে ঢুকল, গায়ে নীল ডোরা কাটা গলাবন্ধ কোট আর খাকি হাফপ্যান্ট, চুলগুলো লম্বা হয়ে মোটা মোটা কানের উপর ঝুলে পড়েছে, তেলচুকচুকে আহ্লাদে-আহ্লাদে বোকা মতন ভাবখানা, দেখেই আমাদের গায় জ্বর এল। আবার আমোদও লাগল একে নিয়ে বেশ একটু-রগড় করা যাবে মনে করে।

ছেলেটার পায়ে ফিতে দেওয়া কালো জুতো একটু কিচকিচ করছিল, তাইতে নগা তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল,

"জুতোর বুঝি দামটা আসচে মাসে দেওয়া হবে?" ছেলেটা কিন্তু কিছু না বলে খাতা পেন্সিল নিয়ে থার্ড বেঞ্চে গিয়ে চুপ করে বসল।

মাষ্টার মশাই বললেন, "ওহে নটবরচন্দ্র, বছরের মাঝখানে এয়েচ, ভাল করে পড়াশুনো কর।"

নাম শুনে আমার ত হেসেই কুটোপাটি, নগা তার তক্ষুণি নাম দিয়ে ফেলল,—"লটবহর"।

সত্যি নগার মতন রসিক ছেলে খুঁজে পাওয়া দায়।

টিফিনের সময় নটবরচন্দ্র একটা ছোট্ট বইয়ের মতন টিনের বাক্স খুলে লুচি আলুর দম খেয়ে, হাত চাটতে চাটতে বার বার আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। তাই না দেখে নগা বললে,

"কি রে ছোঁড়া মানুষ দেখে বুঝি অভ্যেস নেই?"

আমরা তাগ করেছিলাম, চটেমটে ছেলেটা কি করে দেখব। ব্যাটা কিন্তু খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ মুখে হাত দিয়ে বিশ্রী রকম ফ্যাচ ফ্যাচ করে হাসতে লাগল। নগা রেগে বলল—

"অত হাসির কথা কি হল শুনতে পারি?"

ছেলেটা অমনি নরম সুরে বলল—

"কিছু মনে করো না ভাই, সত্যি আমার হাসা উচিত হয় নি, কিন্তু তোমাদের দেখে আমার হঠাৎ মেজমামার পোষা বাঁদরগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। কেবল ঐ ওকে ছাড়া—'

বলে আমাকে দেখিয়ে দিল। নগারা রেগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল, আমি কিন্তু একটু খুশি না হয়ে পারলাম না; অল্প হেসে জিজ্ঞেস করলাম—"আর আমাকে দেখে কিসের কথা মনে হচ্ছে?"

সে অম্লানবদনে বললে—"মুলতানি গরুর কথা।"

ভীষণ রাগ হল। ভাবলাম ছোটবেলা থেকে এই যে শ্যামবাবুর কাছে প্যাঁচ শিখেছি সে কি মিছিমিছি। তেড়ে গিয়ে এইসা এক প্যাঁচ কষে দেবার চেষ্টা করলাম যে কি বলব। সে কিন্তু কি একটা ছোটলোকি কায়দা করে এক সেকেণ্ডে আমাকে আছাড় মেরে মাটিতে ফেলে দিল! ঠিক তক্ষুণি ক্লাশের ঘণ্টা পড়ল, নইলে তাকে বিষম সাজা দিতাম।

ক্লাশের পর বাড়ি যাবার পথে তার জন্য ওৎ পেতে রইলাম, আমি আর একটা ছেলে। সে দেখা হতেই হাসিমুখে বলল,

"কি হে চীনাবাদাম খেতে আপত্তি আছে?"

আমরা আর কি করি, একেবারে ত আর অভদ্র হতে পারি না, তাই চীনাবাদাম নিয়ে তাকে বুঝিয়ে বললাম—"দ্যাখ, নতুন ছেলে এসেছিস, নতুন ছেলের মত থাকবি; আজ দয়া করে তোর চীনাবাদাম খেলুম বলে যেন মনে করিস না যে দুপুরের কথা ভুলে গেছি।"

সে বললে—"রাগ কোর না ভাই! আমি যদি জানতাম অ্যান হোঁৎকা শরীর নিয়েও তুমি এমন ল্যাদাড়ে তবে কি আর কষ্ট করে জনসোয়ানি প্যাঁচ লাগাতাম, এই অমনি দু আঙুলে ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিতাম।'

এই বলে আমাকে কি একটা কায়দা ক'রে চিৎপাত করে দিয়ে নিমেষের মধ্যে সে ত হাওয়া!

এর থেকেই বোঝা গেল সে কি ভীষণ ছেলে। সারারাত মাথা ঘামিয়েও তাকে জব্দ করবার উপায় দেখলুম না। পরদিন সকালে ছোটমামা বলল,

"কি রে ভোঁদা, মুখ শুকনো কেন? পেট কামড়াচ্ছে বুঝি? রোজ বলি অত খাস নি!"

খা ব দ্ধি এদের! বললুম—"যে বিষয় কিছু বোঝ না সে বিষয় কিছু বলতে এস না।"

নটবরকে না পারতে পারি, তাই বলে যে অন্যদেরও এক কথায় চুপ করিয়ে দিতে পারি না, এ কথা যেন কেউ না মনে করে।

হাবুটার কাছ থেকেও কোন সাহায্য পাওয়া গেল না। নিজের বেলা ত খুব বুদ্ধি খোলে, কিন্তু আমি যখন সব খুলে বলে পরামর্শ চাইলাম, সে উল্টে বললে,

"তুই আর তোর নগা না বগা, দুটি মাণিকজোড়। আমার কাছে যে বড় পড়ামর্শ চাইতে এসেছিস; ওরে ছোঁড়া, আগে পরামর্শ নেবার মতন একটু বুদ্ধি গজা!"

নাক সিঁটকে চলে এলুম। হ্যাঁ! জানে ত কেবল হি হি করে হাসতে আর কাল গায়ে লাল জামা চড়িয়ে সং সাজতে! সাধে কি মুনিঋষিরা ওদের বিষয় ঐ সব লিখে গেছেন!

ইস্কুলে গিয়ে দেখি ছেলেটা আজ ফাষ্ট বেঞ্চে গিয়ে বসেছে। একদিনেই দেখি মাষ্টারদের বেশ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল! বোকার মতন মুখ করে থাকলে সবাই অমন পারে। আর বুঝি আন্দাজে কতকগুলো সোজা সোজা প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়েছিল। পড়ত র৮ ঘাড়ে আমাদের সব শক্ত শক্ত প্রশ্নগুলো তবে দেখা যেত।

যাই হোক, একদিনেই নাম করবার তার কিছু এমন ত্যাড়াহুড়ো ছিল না।

নগা বললে—"ব্যাটা খোসামুদে!"

ছেলেটা শুনে বললে, "ছিঃ হিংসে করতে নেই, পরে কষ্ট পাবে!"

রাগে নগা হাতের মুঠো খুব তাড়াতাড়ি খুলতে ও বন্ধ করতে লাগল। গেল বছর যদি ওর টাইফয়েড না হত নিশ্চয় সেদিন একটা কিছু হয়ে যেত।

এমনি করে কদ্দিন যেতে পারে! শেষটা একদিন গবুই এক বিষম ফন্দি বার করল। গবুটা দেখতে রোগা পটকা, আর প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রত্যেক বিষয়ে লাষ্ট হলে কি হবে ছেলেটার খুব বুদ্ধি আছে। সেদিন ক্লাশে এসেই সে নগাকে কাণে কাণে কি বলল। তাই না শুনে উৎসাহের চোটে নগা অঙ্কটঙ্ক ভুল করে কোণে দাঁড়িয়ে একাকার! তাতে বরং একদিক দিয়ে সুবিধাই হল, নগা কোণে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে মৎলবটাকে দিব্যি পাকিয়ে নিল।

সেইদিনই টিফিনের সময় নটবরকে ডেকে নগা বলল—

"ভাই নটবর, যা হবার তা হয়ে গেছে; একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে, হেডমাষ্টারকে তাই একটু সাহায্য করা চাই। তুমি ক্লাশের ভাল ছেলে, তুমি বললে দেখাবেও ভাল; তা ছাড়া তোমার মত গুছিয়ে কেই বা বলতে পারে?"

নটবর খুসি হয়ে বলল—

"তা ত বটেই! ক্লাশের অর্ধেক ছেলে তোৎলা, আর বাকিগুলো একেবারে গবচন্দ্র।"

নগা আশ্চর্য রকম ভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে তেমনি ঠাণ্ডা হয়ে বলল—

"তা, তুমি গিয়ে তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে বলবে যে তাঁর বাবার শ্রাদ্ধে তুমি কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে সাহায্য করতে চাও। এই একটু সম্মান দেখাবার জন্য আর কি? বুঝলে ত? ভাল করে বুঝিয়ে বোলো, এই কাল ওঁর বাবা মারা গেছেন কিনা।"

নটবর হাঁ করে শুনে বলল—

"আহা তাই নাকি? তোমরা ভেব না, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। তোমরা একটু অপেক্ষা করে থাকলে ফল টের পাবে।"

বলে হেডমাষ্টারের ঘরের দিকে চলে গেল। তার ঐ 'টের পাওয়ার' কথাটা আমার ভাল লাগল না। 'টের পাওয়া' বলতে আমরা অন্য মানে বুঝি। সে যাই হোক গে।

ক্লাশের ঘণ্টা পড়বামাত্র নটবর ছুটতে ছুটতে এসে বলল,—

"হেডমাষ্টার রাজি হয়েছেন। তোমাদের কজনকে এক্ষুণি ডেকেছেন কি সব কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্য। তোমরা কি করে জানলে, তাও জিজ্ঞেস করছিলেন। মনে হল খুব খুশি হয়েছেন। তোমরা এক্ষুণি যাও।"

আমরা প্রথম ত অবাক্। শ্রাদ্ধের কথাটা গবুর সম্পূর্ণ বানানো। কোথায় নটবর ইয়ার্কি দেবার জন্য মার খাবে, না সত্যি হেডমাষ্টারের বাপের শ্রাদ্ধ! এ রকম কিন্তু আরও হয়। আমি একবার একটা অচেনা ছেলেকে মজা দেখবার জন্য বলেছিলাম,

"কি হে, চাটগাঁ থেকে কবে এলে?"

সে বলল—"কাল এলাম; তুমি কি করে জানলে?" আমি অবিশ্যি আর কিছু ভেঙ্গে বলি নি।

যাই হোক, আমরা ত গেলাম। দেখলাম হেডমাষ্টার গোমড়া মুখ করে ফার্ষ্ট ক্লাশের ছেলেদের ইংরিজি খাতায় লাল পেন্সিলের দাগ কাটছেন। আমাদের দেখে খেঁকিয়ে বললেন,—

"কি, ব্যাপার কি তোমাদের? ক্লাশ নেই নাকি, এখানে যে বড় দঙ্গল বেঁধে এসেছ?"

নগা গলা পরিষ্কার করে বলল,—

"আজ্ঞে, আপনার বাবার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে এসেছি। এই আমরা—" এইটুকু বলতেই হেডমাষ্টারের এক ভীষণ পরিবর্তন হল। মুখটা লাল হয়ে বেগুনী হল, হাতের পেন্সিলের মোটা শিষ মট করে ভেঙ্গে গেল, গোঁফ-চুল সব খাড়া হয়ে গেল, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। তার চোটে সার্টের গলার বোতাম ফট করে ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেল। কি রকম একটা শব্দ করে আস্তে আস্তে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমরা এতক্ষণ হাঁ করে দেখছিলাম, এবার হঠাৎ একটা বিকট সন্দেহ হল। নটবর আগাগোড়া মিছে কথা বলেছে। হেডমাষ্টার ডাকেন নি। সে হয় ত দেখাই করে নি!

হেডমাষ্টার গর্জন করে উঠলেন, জানলার খড়খড়ি কেঁপে উঠল। আমরা ছিটকে বাইরে এসে পড়লাম; তিনি ফেলে দিলেন কি আমরাই পালিয়ে গেলাম, আজও ঠিক জানি না। কাঁপতে কাঁপতে ক্লাশে ঢুকেই শুনলাম, পণ্ডিতমশাই নটবরকে বলছেন,

"সে কি নটবর, হেডমাষ্টারের ভাইপো তুমি, সে কথা এদ্দিন বল নি!"

নটবর বল্‌লে—

"বাবা বলেন ও সম্পর্কটা কিছু ঢাক পেটাবার মত নয়। তা ছাড়া ইস্কুলটা বাজে। এইমাত্র কাকাকে সেই কথা বলে এলাম। তিনি ত রেগে কাঁই।"

এমন সময় দরোয়ান এসে বলল,

"নগুবাবু আর ভোঁদাবাবুকে বেত খেতে হেডমাষ্টারবাবু ডাকছেন।"

তাই শুনে পণ্ডিতমশাই বললেন—

"আর হ্যাঁ, বেত খেয়ে এসে আধ ঘণ্টা বেঞ্চে দাঁড়াবে, লেট করে ক্লাশে এসেছ।"

তাই বলি পৃথিবীটাই অসার।

কীর্তিপদর কীর্তি



সুনির্মল বসু

বঙ্গেশ্বরবাবু বেজায় ভাবনার মধ্যে পড়ে গেছেন। দেশে যেটুকু জমিজমা ছিল তা বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে সম্প্রতি কলকাতায় এসে 'ডিণ্ডিম' নামে তিনি একখানি দৈনিক কাগজ বের করেছেন।

কিন্তু কাগজের কাটতি নেই একেবারে। দুই পয়সা দামের কাগজ এখন এক পয়সায় নেমেছে—তবু কাগজের চাহিদা নেই।

বঙ্গেশ্বরবাবুর বরাৎ মন্দ। প্রথম প্রথম 'হকার'রা কিছু কিছু কাগজ চালাত বটে, কিন্তু এখন আর তারা নিতেও চায় না। জোর করে ত আর ভদ্রলোকদের কাগজ গছানো যায় না! 'ডিণ্ডিম' বিক্রি করে 'হকার'দের কোন লাভ নেই। তাই তারা এখন আর বঙ্গেশ্বর বাবুর কার্যালয়ের ছায়া মাড়ায় না।

প্রথম প্রথম কাগজ ছাপান হত এক হাজার—তারপর পাঁচ শ থেকে এখন আড়াই শতে এসে দাঁড়িয়েছে। তাও সবই প্রায় পড়ে থাকে।

কেন—এর অর্থ কি?—অন্য অন্য কাগজ থেকে 'ডিণ্ডিম' কোন বিষয়ে খারাপ? তার সম্পাদকীয় স্তম্ভ, সংবাদ বিভাগ, খেলাধূলার বৃত্তান্ত—কোন কাগজের থেকে নিকৃষ্ট? 'ডিণ্ডিমের' ছাপা, কাগজ, ভাষা, ভঙ্গী—কোন কাগজের থেকে হীন? বরাৎ—বঙ্গেশ্বর বাবুর বরাৎ!

এত সহজেই হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। দেশের যেটুকু সামান্য জমিদারী ছিল—তাও গেছে, এখন এই কাগজটিকে আবার তুলতে না পারলে—শেষে যে ভাতে টান পড়বে!

বঙ্গেশ্বরবাবু অস্থির হয়ে পড়লেন।

কাগজ বিক্রি হয় না,—কাজেই বিজ্ঞাপনও পাওয়া ভার। যারা আগে খাতিরে পড়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল—তারাও তুলে নিয়েছে।

প্রেসের কর্মচারিদেব মাইনে বাকি, তারা বারে বারে শাসাচ্ছে—

কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। যেটুকু পুঁজি বঙ্গেশ্বর বাবুর ছিল তাও নিঃশেষপ্রায়।

হায়, হায়, হায়,—বঙ্গেশ্বরবাবুর অবস্থা অতি শোচনীয়। বঙ্গেশ্বর বাবুর কি দোষ? একান্ত শত্রু না হলে 'ডিণ্ডিম' কাগজের নিন্দা কেউ করতে পারে না।

আমরা নিজেরা কয়েক সংখ্যা 'ডিণ্ডিম' পড়ে দেখেছি—অনেক আজে বাজে কাগজের থেকে তা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। 'ডিণ্ডিমের' সম্পাদকীয় মন্তব্য অতি মূল্যবান, দেশ বিদেশের খবর সব আনকোরা টাটকা, ছাপা ঝরঝরে,—কাগজ তকতকে,—এক কথায় বলতে গেলে অন্য দশটি শ্রেষ্ঠ কাগজের মধ্যে 'ডিণ্ডিম'ও একখানা। তারপর 'ডিণ্ডিমে' আবার ছবি ছাপা হয়। এক পয়সার কোন কাগজ ছবি ছাপতে সাহস করে?

বঙ্গেশ্বরবাবুর কোনও দোষ নেই,—সম্পাদকের দিক থেকে তাঁর কোন ত্রুটি নেই, দোষ তাঁর অদৃষ্টের।

ডিণ্ডিমের সহকারী সম্পাদক কীর্তিপদবাবু দূর সম্পর্কে বঙ্গেশ্বরবাবুর মামাতো ভাই! ডিণ্ডিমের অবস্থা দেখে কীর্তিপদবাবুও বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ডিণ্ডিমের সঙ্গে তাঁর অদৃষ্টও বিশেষভাবে জড়িত।

কীর্তিপদ বাবু 'মরিয়া' হয়ে উঠলেন। যে করেই হোক কাগজখানার কাটতি বাড়াতেই হবে,—রামা-শ্যামা যে-সে কাগজ চালিয়ে ফেঁপে উঠল—আর তারাই কি এত অক্ষম? না,—একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে!

সেদিন সকালে 'ডিণ্ডিম' কাগজ মাত্র তিনখানা বিক্রি হয়েছে।

বঙ্গেশ্বরবাবু হতাশ হয়ে কীর্তিপদবাবুকে বললেন—"ওহে কীর্তিপদ, যা হবার তা হয়েছে—কাগজ তুলে দাও,—এভাবে আর কত ডোবা যায়?"

কীর্তিপদবাবু ভিতরে ভিতরে বেজায় দমে গেছেন। কিন্তু সে ভাব

যথাসম্ভব গোপন রেখে হাসি-হাসি মুখে বল্লেন, "যখন ডুবেছি,—তখন একবার পাতালটা দেখে আসা দরকার।"

বঙ্গেশ্বরবাবু বিরক্ত হয়ে বল্লেন—"ঠাট্টার আর সময় নেই। গাঁটে আর এমন কড়ি নেই—যা দিয়ে এই ভূতের বেগার খাটা যায়। এদিকে বাড়িওলা নালিশ রুজু করেছে,—প্রেসের কর্মচারীরা একেবারে মারমুখো।"

কীর্তিপদবাবু বাইরে আরও উৎসাহের ভাব এনে বল্লেন—"আচ্ছা, আরও কয়েকটা দিন দেখা যাক—তারপর যা করতে হয় করা যাবে।"

বঙ্গেশ্বরবাবু বল্লেন—"আমার শরীর, মন অত্যন্ত খারাপ,—আমি চল্লাম বাড়িতে। তুমি কয়দিন চেষ্টা করে ছাখো।—আমি আর এ বিষয়ে মাথা ঘামাতে পারছি না।"

সারা সহরে হুলস্থূল। আজ সকল বেলার দৈনিক কাগজ 'ডিণ্ডিমে' বড় বড় অক্ষরে এই খবরগুলি ছাপা হয়েছে,—

১। মহাত্মা গান্ধীর ৫০ ঘণ্টা ব্যাপী হেদুয়ায় সন্তরণ।

২। ষ্টার রঙ্গমঞ্চে চাণক্যের ভূমিকায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

৩। 'ক্যালক্যাটা গ্রাউণ্ডে' রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ ক্রীড়া-নৈপুণ্য।

৪। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর গাত্র হইতে বহুমূল্য অলঙ্কার অপহৃত।

৫। প্রফুল্ল ঘোষের অনশন ব্রত উদ্‌যাপন।

৬। শিশির ভাদুড়ী খাদি আশ্রমে অভিনন্দিত।

৭। উড়োজাহাজে গোষ্ঠ পালের পারস্য যাত্রা।

৮। গোপালগঞ্জের মহারাণীর পূর্বে দাড়ি ছিল কি না?

আর আর অন্য কাগজের কাটতি নাই। সহরের যত 'হকার' এসে বারে বারে হানা দিচ্ছে 'ডিণ্ডিম' কার্যালয়ে। কাগজের দাম এক

পয়সা থেকে তুই আনায়—ক্রমে চার আনায় দাঁড়াল, তবুও কাগজের অসম্ভব চাহিদা।

'ডিণ্ডিম' আজ আর আড়াই শ নয়, বিশ হাজার ছাপা হয়েছে।

কীর্তিপদবাবুর আজ আর বিশ্রাম নাই,—ঠং ঠং করে খালি টাকা বাজাচ্ছেন আর দেরাজে ভরছেন—তার আর নাওয়া খাওয়ার ফুরসৎ নেই।

বঙ্গেশ্বরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কীর্তিপদ বাবুকে বল্লেন—"সর্বনাশ করেছ যে হে—এই রকম জলজ্যান্ত মিথ্যা কথাগুলো কাগজে বের করেছ?"

কীর্তিপদবাবু দেরাজ খুলে একরাশ টাকা পয়সা নোট বঙ্গেশ্বরবাবুর সামনে ধরে বল্লেন—"ওসব কথা পরে হবে এখন,—এই নিন, আজকের কাগজের বিক্রি প্রায় তিন হাজার টাকা; বাড়িভাড়াটা আজকেই চুকিয়ে দিন,—পরে আবার দেখা যাবে।"

অতগুলো টাকা সামনে দেখে বঙ্গেশ্বর বাবু চমকে গেলেন,—বল্লেন, —"কিন্তু কালকে ত আর একখানা কাগজও বিক্রি হবে না—এরকম মিথ্যা সংবাদ লোকে নিশ্চয়ই বরদাস্ত করবে না।"

কীর্তিপদবাবু বল্লেন—"সে যা হয় আমি ব্যবস্থা করব। আপনি আজ আর বাইরে বেরুবেন না। 'ডিণ্ডিম' সম্পাদক বলে অনেকেই আপনাকে চেনে। রাস্তায় দেখলে কেউ আর আস্ত রাখবে না। আমি একবার চট করে দেখে আসি মহাত্মাজীর সাঁতার দেখতে হেদোয় কি রকম ভীড় হয়েছে—"

পরের দিন সকাল বেলা 'ডিণ্ডিম' কাগজে প্রকাণ্ড অক্ষরে ছাপা হল—

ক্ষমা প্রার্থনা

প্রেসের গোলমালে কাল আমাদের কাগজের কয়েকটি সংবাদে মারাত্মক রকমের ওলটপালট হইয়া গিয়াছে,—সেগুলি আজ সংশোধন করিয়া বাহির করা হইল। এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য করযোড়ে আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

খবরগুলি এইরূপ হইবে ;—

১। মহাত্মা গান্ধীর অনশন ব্রত উদ্‌যাপন !

২। ষ্টার রঙ্গমঞ্চে চাণক্যের ভুমিকায় শিশির ভাদুড়ী।

৩। ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডে গোষ্ঠ পালের অসাধারণ ক্রীড়া-নৈপুণ্য।

৪। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর পূর্বে দাড়ি ছিল কি না ?

৫। প্রফুল্ল ঘোষের ৫০ ঘণ্টা ব্যাপী হেদুয়ায় সন্তরণ।

৬। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র খাদি আশ্রমে অভিনন্দিত।

৭। উড়ো জাহাজে রবীন্দ্রনাথের পারস্য যাত্রা।

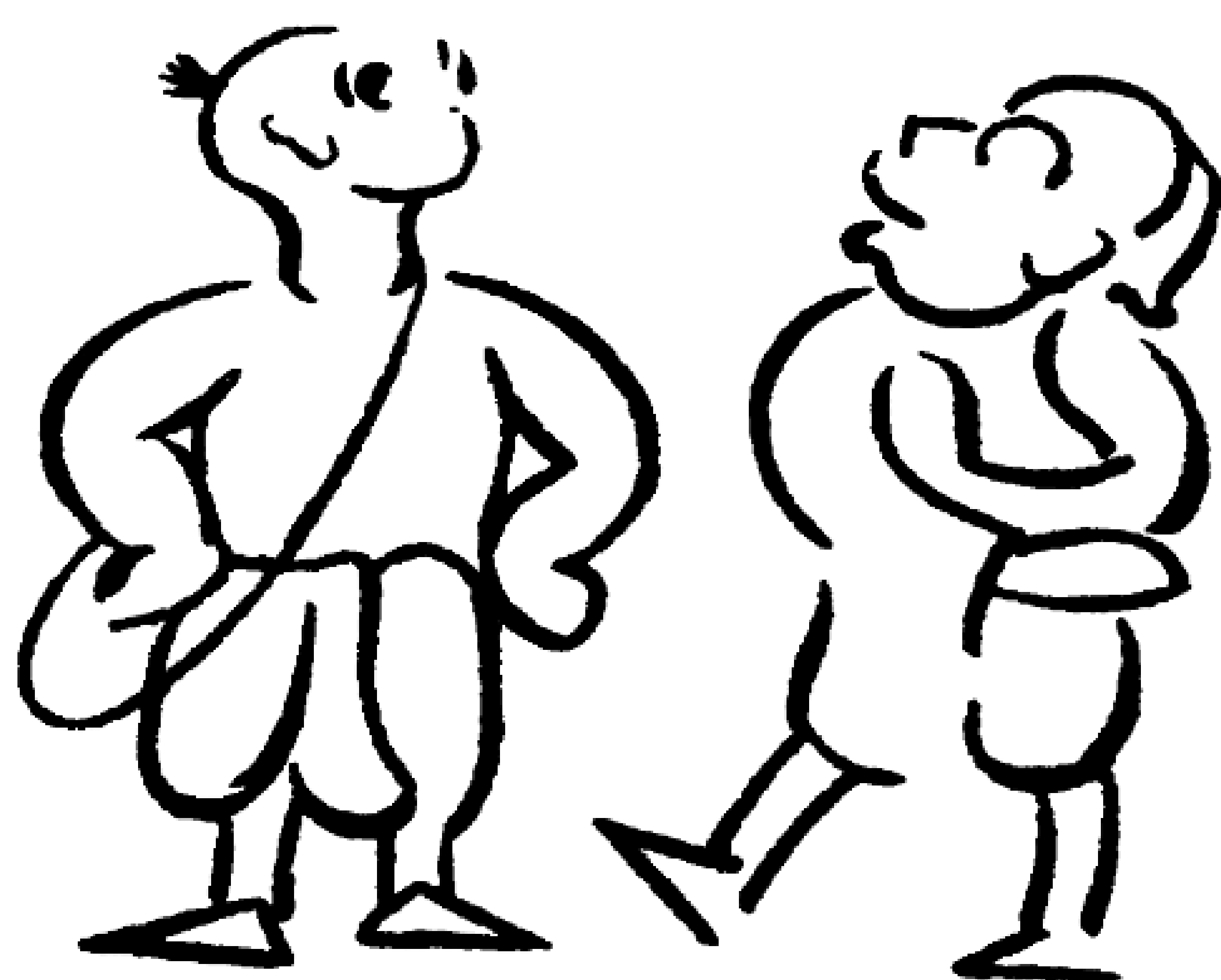
৮। গোপালগঞ্জের মহারাণীর গাত্র হইতে বহুমূল্য অলঙ্কার অপহৃত।

'ডিণ্ডিমের' অবস্থা ফিরে গেছে। দেশের লোকের নজর এখন ডিণ্ডিমের দিকে। সহরে ত কথাই নাই—মফঃস্বলে ও তার অসম্ভব কাটতি।

বঙ্গেশ্বরবাবুর চিন্তা দূর হয়েছে। আর কীর্তিপদ বাবু ?

কীর্তিপদ বাবু নতুন মোটর কিনেছেন,—আর বালিগঞ্জের লেকের ধারে জমি কিনবার ফিকিরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

হরি-হর



চারুচন্দ্র চক্রবর্তী

একই রাস্তার এপার ওপার ঠিক মুখোমুখী দুইখানি বাড়ি। একখানি শাদা রংএর একতলা, তার দেওয়ালের গায়ে লেখা আছে—ডাক্তার হরিনাথ ধর।" আর একখানি লাল রংএর দোতালা, গেটের উপর লেখা—ডাক্তার হরনাথ কর। দুই ডাক্তারে ভাবের আর অন্ত নাই। ধর করের নাম শুনিলেই বলে 'পাজী', আর কর ধরের ছায়া দেখিলেই বলে 'ছুঁচো'। পাড়ার লোকে বলাবলি করে, 'হরিনাথ হরনাথ যেন হরি-হর আত্মা।'

'হরিনাথ ওপারের দোতলার দিকে কটমট করিয়া তাকায় আর দাঁতে কড়মড় করিয়া বলে, "একটা ভূমিকম্প, ভগবান, একটা ভূমিকম্প! সকালে উঠে যেন দেখতে পাই, ঐ দোতালার সব ইট ধুলোয় গড়াগড়ি। দিন যায়, ভূমিকম্পও দুই-একটা হয়, কিন্তু দোতলার ইট ঠিকই থাকে। শেষটার স্থির হইল নিজের বাড়িটাই দোতলা করিতে হইবে। গিন্নীর কাছে কথাটা পাড়িতেই তিনি অবাক হইয়া কহিলেন,—"টাকা?"

হরিনাথ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "কিছু হাতে আছে. আর বাকিটা ভাবছি তোমার গয়নাগুলো যদি—"

গিন্নী তিন হাত ছিটকাইয়া গিয়া নথ নাড়িয়া হাত ঘুরাইয়া বলিলেন, "আহা-হা! সখ দেখে আর বাঁচি না!"

স্ত্রীর সেই মূর্তি দেখিয়া হরিনাথের বুক শুকাইয়া যায়। দোতলার আশা ঐ পর্যন্তই থাকে।

সেদিন দুপুর বেলা হরিনাথ খাইতে বসিয়াছে; আর, হরনাথ দাড়ি কামাইবার জন্য মুখে সাবান মাখিতেছে। এমন সময়ে রাস্তা থেকে কে ডাকিল, "ডাক্তার বাবু আছেন?" দুই ডাক্তার এক সঙ্গে সাড়া দিয়া কহিল, "আজ্ঞে, আসুন"। মিনিট খানেকের মধ্যেই দুই জনে দুই দিক থেকে বাহির হইয়া আসিল, এবং পরস্পরের

দিকে এমন করিয়া তাকাইল, যে সত্যিকাল হইলে দুইজনেই ভস্ম হইয়া যাইত। ভাগ্যিস এটা কলিকাল! হরনাথের হাতে সাবান মাখা ব্রাশ, আর হরিনাথের হাতে ডাল-মাখা ভাত। লোকটি ত অবাক।

হরিনাথ বলিল, "আপনার কি অসুখ?"

সঙ্গে সঙ্গে হরনাথও কহিল, "আপনার কি অসুখ?"

হরিনাথ হাঁকিয়া কহিল, "সাবধান বলছি।"

হরনাথ আরও জোরে হাঁকিল, "সাবধান, বলছি।"

ব্যস। লাগিয়া গেল হরি-হরের যুদ্ধ। পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, হরিনাথের ভাত গিয়াছে হরনাথের ডান গালে, আর হরনাথের সাবান আসিয়াছে হরিনাথের বাঁ গালে, রোগী অনেকক্ষণ চম্পট দিয়াছে।

দিন দুই পরে ডাক্তার ধর সকাল সকাল খাওয়া শেষ করিয়া একটা ব্যাগ হাতে করিয়া রোগীর বাড়ি যাত্রা করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার করও অন্য ফুটপাথ ধরিয়া ঠিক একই তালে পা ফেলিয়া ব্যাগ ঝুলাইয়া চলিয়াছে। পথে একজন ভিখারী পয়সা চাহিতে, হরিনাথ একটি পয়সা দিল। হরনাথ ভাবিল, আমার বুঝি পয়সা নাই? কিন্তু কাছে অন্য ভিখারী নাই, সুতরাং উহাকেই ডাকিল,—"ওরে!"

ভিখারী ডাক শুনিয়া ভয় পাইল, ভাবিল, ডাক্তার নিশ্চয়ই তাহাকে অস্ত্র করিবে। অতএব, আর কোন দিকে না চাহিয়া সোজা দৌড়! হরনাথ ছাড়িবে কেন? সেও পিছন পিছন ছুটিল। মিনিট পনেরো পরে ভিখারীকে ধরিয়া টানিতে টানিতে হরিনাথের সম্মুখে আনিয়া তাহার হাতে দুইটা পয়সা দিল।

হরিনাথও সঙ্গে সঙ্গে তিনটি।

অমনি হরনাথ চারটা। এমনি করিয়া কর যত দেয়, ধর দেয় আরও বেশি, আবার ধর যত দেয়, কর দেয় তারও বেশি। দেখিতে দেখিতে পয়সা ফুরাইয়া গেল।

তখন টাকা। টাকাও ফুরাইয়া গেল।

তখন নোট। নোটগুলাও যখন শেষ হইয়াছে, দুইজনে দুইজনের দিকে জ্বলন্ত চোখে একবার তাকাইয়া চলিয়া গেল। ভিখারীটা রাস্তায় দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। টাকা না দিয়া মার দিলে সে অনেক খুশি হইত।

সিধু সরকার হরনাথের রোগী। সেদিন অবস্থা একটু খারাপ হইয়া পড়িতেই তাহার ছেলে ডাক্তার বাবুকে ডাকিতে ছুটিয়াছিল। পথে হরিনাথের সঙ্গে দেখা। "কিরে বাঙ্কা? শোন শোন, ছুটছিস কেন?"

বাঙ্কা কহিল, "আজ্ঞে, বাবার বড্ড অসুখ, ও ডাক্তার বাবুকে—"

হরিনাথ কহিল, "অসুখ? তবে চল, দেখে যাই।"

বাঙ্কা বলিল, "কিন্তু…"

"আবার কিন্তু কি রে? চল।"

সিধুর ডান হাতে হরনাথ একটা মাত্র ইনজেকসন দিয়াছিল। সুতরাং হরিনাথ বাঁ হাতে দুইটা ইনজেকসন লাগাইয়া দিল। তাই শুনিয়া হরনাথ ডান হাতে দিল আর তিনটা, এবং পরদিনই হরিনাথ আসিয়া বাঁ হাতে চারটা; এমনি করিয়া চলিল।

সিধু যত বলে "মরে গেলাম ডাক্তার বাবু, আর ফুঁড়বেন না" হরিনাথ তত বেশি করিয়া ফোঁড়ে আর বলে, "ঐ পাজীটার হাতে যদি না মরে থাক, আমার হাতে মরবে না।"

সিধু সারিয়া উঠিল বটে, কিন্তু হাত দুইখানা গেল। ক্ষতি পূরণের

দাবীতে সে দুই ডাক্তারের নামে নালিশ রুজু করিল। জজ সাহেব আসামীদের তলব করিলেন। বিচারে স্থির হইল, হরিনাথের অপরাধ বেশি; তাহার জরিমানা দু শ টাকা, আর হরনাথের দেড় শ। হরনাথ হাত জোড় করিয়া কহিল, "হুজুর, আমারও দুশ টাকা জরিমানা আজ্ঞা হোক।"

জজ সাহেব অবাক হইয়া কহিলেন, "কেন?"

"আজ্ঞে ঐ ছুঁচোটা যদি দু শ দেয়, আমিও দিতে পারব।"

হরিনাথ রাগে গস গস করিতে করিতে কহিল, "আর ঐ পাজীটা যদি দু শ দেয়, হুজুর, আমি দেব তিন শ।"

হরনাথও রুখিয়া উঠিয়া কহিল, "তা হলে আমার চার শ।" মারামারির উপক্রম। তখন পুলিশ আসিয়া দুই জনকে থামাইল। জজ সাহেব দেখিলেন, মহাবিপদ, কহিলেন, "আচ্ছা, আবার বিচার হবে।"

পরের দিন আদালতে ভীষণ ভীড়। জজ সাহেব হুকুম দিলেন, "তোমাদের শাস্তি—আমার সামনে দাঁড়িয়ে, সমস্ত এজলাসের কাছে তোমরা দু জনে কোলাকুলি করবে।"

ধর ও করের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

হরিনাথ কাঁদিয়া কহিল, "হুজুর, আমাকে সাত বছর জেল দেন। তবু ওটা পারব না।"

হরনাথও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমাকে আট বছর দিন, হুজুর!"

জজ সাহেব হাঁক দিয়া কহিলেন, "আমার হুকুম মানতে হবে।"

তারপর দুই ডাক্তারকে মুখোমুখী দাঁড় করান হইল। জজ সাহেব বলিলেন, "এক—দুই—তিন।"

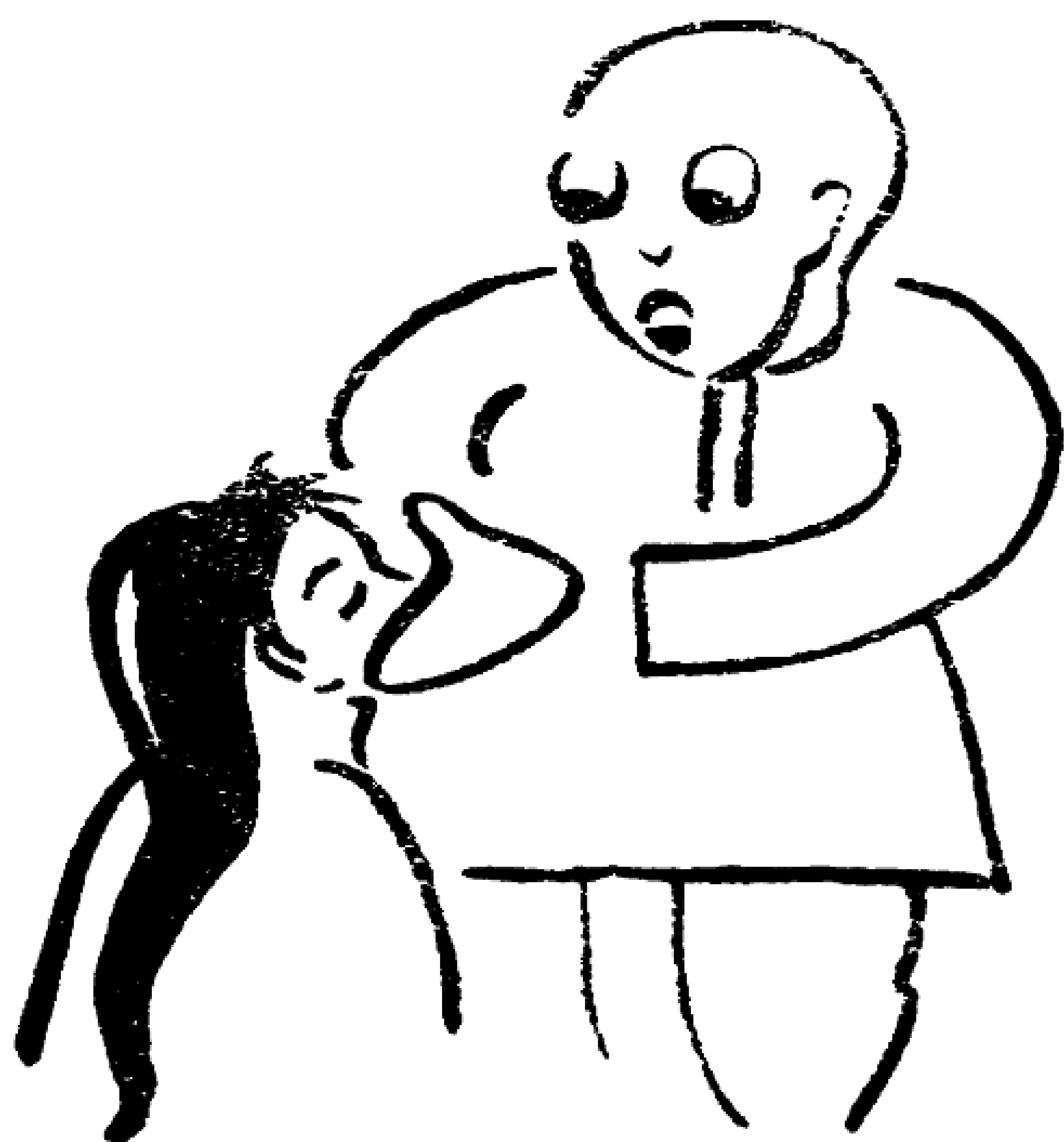
ব্যাস। ধরে এবং করে কোলাকুলি হইয়া গেল।

সব গোল এবার একেবারে মিটমাট। আজকাল দুই ডাক্তারে

বেজায় ভাব। হরিনাথ ডাকে, "ভাই হরনাথ!" হরনাথ বলে, "কি ভাই হরিনাথ!"

পাড়ার লোকে আবার বলাবলি করে, "হরিনাথ আর হরনাথ—যেন হরিহর-আত্মা!"

হরিহরবাবুর মৃত্যুভয়



ধ্রুবেশচন্দ্র অধিকারী

আমাদের হরিহরবাবু ভয়ানক ভয় পেয়েছেন। ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলি তাহলে।

এক রবিবার হরিহরবাবু রোয়াকে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, এমন সময়ে জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী এসে হাজির! সন্ন্যাসী এসেই হরিহরবাবুকে বললে,

"বাবু তুমকো কপাল বহুৎ খারাপ হ্যায়, হামকো কুছ ভোজন দিলাও! সাধুকো খিলানেসে তুমহারা আচ্ছা হোগা।"

হরিহরবাবু চিরকালই সাধুসন্ন্যাসীর উপর সদয়! তার ওপরে সাধু বলেছেন তাঁর কপাল সুবিধে নয়। তিনি তাড়াতাড়ি, সাদর অভ্যর্থনা করে, সাধুকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে, নানারকম খাবারের ব্যবস্থা করলেন।

সাধুবাবা সে সবের সদ্ব্যবহার সমাধা করে শেষে বললেন, "দেখ বাচ্চা, সামনে হপ্তামে তুমহারা খতম হো যায়গা। যো কুছ করনা হ্যায় ইসকো ভিতর করলেও, শনিচ্চরকো উধর তুম আউর নেহি যাওগে।"

এই কথা শুনেই ত' হরিহরবাবুর মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি ম্লানমুখে সাধুবাবাকে বিদায় দিলেন। এত খাইয়েও দাইয়েও, শেষটায় এই শনিচ্চড় লাভ করতে হবে এতটা তিনি প্রত্যাশা করেন নি—

হরিহরবাবুর আতঙ্ক হওয়া অস্বাভাবিক নয়, প্রাণের ভয় কার না হয়, তার ওপরে তাঁর অত বড় সম্পত্তি তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাঁর ছেলেরা এখনও নাবালক—তাঁর সম্পত্তির সঙ্গে তারাই বা কোথায় কার হাতে গিয়ে পড়বে এই তাঁর ভাবনা হল। তার ওপর তাঁর ইচ্ছা ছিল, মরবার আগে, ছেলেদের বিয়ে দিয়ে সংসারী করে যাবেন। কিন্তু যেরকম গতিক দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয়,

ভগবান তাঁর ওপর তেমন খুশি নন, তাঁর মনের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করে যেতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

হরিহরবাবুর গিন্নী কিন্তু এসব শুনে কিছুমাত্র ঘাবড়ালেন না। তিনি বললেন, "ওরা সব ভণ্ড। ওদের কথা কি বিশ্বাস করতে আছে? উপায়ের মৎলবেই ওরা ওই রকম বলে থাকে।"

হরিহর বাবু বললেন, "সাধুর কথা কখনও মিথ্যে হয়? তা ছাড়া কাল রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখেছি একটা গাধা আমাকে চাট মেরে ফেলে দিয়েছে—(সেই স্বপ্নের দৃশ্যটা এখনও তিনি মনশ্চক্ষে যেন দেখছিলেন)—সেই গাধা আর কেউ না, গিন্নী, সাক্ষাৎ যমদূত! এবার আমার ভালোমন্দ একটা কিছু না হয়ে আর যায় না।—"

তাছাড়া গৃহিনীর কথায় হরিহরবাবুর কোনদিনই খুব আস্থা ছিল না, তিনি দেরি না করে ব্যাঙ্ক থেকে তাঁর টাকাকড়ি সব তুলে আনলেন, এবং প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই ছেলেদের নামে উইল করে দিলেন, এবং তাঁর এক ভাগ্নেকে,—তাঁর একমাত্র সেই ভাগ্নের কথা ভেবে আজ তাঁর ভারি দুঃখ হতে লাগল। ভাগ্নের গায়ে হাত তুলতে নেই, কিন্তু হঠাৎ রাগের চোটে, কিছুদিন আগে তাকে এক চপেটাঘাত করেছিলেন। সেই থেকে বেচারি বাড়িছাড়া। কোথায় গেছে কেউ জানে না, নানারকমে খোঁজ করেও কোনও ফল হয়নি। আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দিয়েও না। ভাগ্নের জন্য তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, ক্ষেপে গেছেন, খাবি খাচ্ছেন ইত্যাকার সব ঘোষণাও কোনও কাজে লাগেনি। বাপমা-হারা অনাথ সেই ভাগ্নের নামে—যদি সে কখনও ফিরে আসে, তাঁর বড় একটা তালুক, আর নগদ হাজার দশেক তিনি দানপত্র করে দিয়ে গেলেন।

এই সব কাজ সুচারুরূপে নিষ্পত্তি করতেই দু দিন গেল। তারপর তিনি কলকাতার সব ডাক্তারকে ডাক দিলেন। একসঙ্গেই কল দিলেন সবাইকে। কিন্তু, তারা, সবাই মিলে, নানাভাবে পরীক্ষা করেও,

হরিহরবাবুর দেহ-যন্ত্রে বিশেষ কোনও রোগই আবিষ্কার করতে পারল না।

তারা সবাই একবাক্যে বলে গেল, দিব্যি আছেন মশাই! আপনার দেহে ত কোনও ব্যাধিই দেখতে পাচ্ছিনে!—এই বলে দস্তুরমত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিমর্ষ মুখেই তারা বিদায় নিল।

তাদের কথায় হরিহরবাবুর একেবারেই বিশ্বাস হল না। তিনি ভাবলেন, হয় এরা উজবুক, একদম কিচ্ছু জানে না, ডাক্তারির ড-ও ঢোকেনি তাদের পেটে। নয় তারা যুক্তি করে সবাই জুটে ফাকি দিচ্ছে তাঁকে। আরও বেশি ভিজিট আদায় করবার মৎলবেই কিনা কে জানে!

কিন্তু হরিহরবাবু দমবার পাত্র নন। তিনি বাজার থেকে মোটা মোটা ডাক্তারির বই কিনে এনে নিজেই আগাগোড়া পড়তে সুরু করে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই প্রেসক্রুপশন করে ডিসপেনসারি থেকে নানারকম ওষুধ কিনে আনাচ্ছেন, সেগুলো, দাগে দাগে ঘণ্টায় ঘণ্টায়, নিয়মিতভাবে সেবনের কোনও ত্রুটি করছেন না। একটা ষ্টেথিসকোপ অবধি কেনা হয়ে গেছে, তাই কানে লাগিয়ে গভীর মনোযোগে, মাঝে মাঝে, নিজের বুক নিজেই তিনি পরীক্ষা করে দেখছেন। এইভাবে যথাসাধ্য নিজের চিকিৎসা নিজেই তিনি করতে লেগেছেন। কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। কাজেই সহজে মারা যেতে তিনি প্রস্তুত নন। বিনা চিকিৎসায়, বেঘোরে, বিনাবাক্যব্যয়ে, একটি টুঁ-শব্দও না করে অক্লেশে দেহরক্ষা করবেন, আমাদের হরিহরবাবু মোটেই সে বান্দা নন।

কিন্তু কদিনই বা আর? আজ বুধবার, আর এই আসন্ন শনিবার —আসছে শনিবারই ত তাঁর নির্ঘাৎ—?

ভাবতে ভাবতে হরিহরবাবু শিউরে উঠেছেন। চোখ ফেটে জল এসে পড়েছে তাঁর। খানিকক্ষণ আপন মনে কেঁদেকেটে চোখ মুছে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন। মুক্ত বায়ু সেবনের জন্যে একটি মোটর কেনার

দরকার—অচিরেই দরকার। হাওয়া বদলে অনেক সময়ে লোকে বেঁচে গেছে এই রকম শোনা যায়। আর যদি মরতেই হয়, হাওয়া খেয়েই মরবেন, দুঃখ কি? মোটরে চেপে সশরীরে স্বর্গে গিয়েও সুখ আছে।

মোটর কিনে আর কি, সকালে আর বিকেলে, সারাদিন গড়ের মাঠে তিনি ঘুরে বেড়ালেন।

পরের দিন বৃহস্পতিবার হরিহরবাবুর দুশ্চিন্তা আরও বাড়ল। এবার তিনি পুত্রদের বিবাহের জন্য ক্ষেপে উঠলেন।

হরিহরবাবুর স্ত্রী ত শুনেই খাপ্পা। তিনি বললেন, "বলি, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ঐ দুটো কচি কচি ছেলে, দুধের বাছা, ওদের বিয়ে দেবে? বলছ কি?"

কিন্তু হরিহরবাবু নাছোড়বান্দা, তাঁর বহুদিনের বাসনা, ছেলেদের সংসারী দেখে দু চোখ বুজবেন। সে মনোভিলাষ পূর্ণ না করে তিনি মারা যান কি করে? অতএব বিকেলের দিকে কোত্থেকে আরও নেহাৎ কচি-কচি দু ফোঁটা দুটো মেয়ে ধরে এনে, পুরুত ডাকিয়ে, গোধুলি লগ্নে ধুমধাম করে, ছেলেদের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

অবশেষে শুক্রবার এসে পড়ল। আজ সকাল থেকেই, হরিহরবাবু ঝুড়ি ঝুড়ি ফল কিনে, সহরের যত ঠাকুরবাড়ি ছিল সব জায়গায় পুজো পাঠাতে সুরু করেছেন। যদি দেবতাদের দয়ায় কোনগতিকে বেঁচে যান এ যাত্রা। হরিহরবাবু মরবার জন্য অপ্রস্তুত নন। আর তেমন নারাজ নন এখন। মরীয়া হয়েই রয়েছেন বলতে গেলে, তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হয়। চেষ্টা করতে দোষ আছে? করেও থাকে মানুষ। তাছাড়া দৈবের কৃপায় কী না হয়—? রক্ষা পাওয়া ত সামান্য কথা! কখনও পায়নাকি কেউ কোথাও?

অতএব, পুরুষকারের সাহায্যে, দৈবকে কাবু করা যায় কি না, খুশি করতে পারা যায় কিনা তাই জানবার জন্যেই তিনি উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

আজ আর তিনি বেড়াতে বেরুলেন না। আজ দৈবই তাঁর ভরসা। ঘরে বসেই, তাঁর নিজের ব্যবস্থামত যাবতীয় ওষুধ, সব এক জোট করে একত্র মিকশ্চার বানিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। সব ওষুধের সম্মিলিত ফল একটা আছেই, এবং সে ফল অব্যর্থ হতে বাধ্য। মাঝে মাঝে সেই মিকশ্চার খাচ্ছেন, আর তখন থেকে ঠায় একভাবে বসে কানে আর বুকে স্টেথিসকোপ লাগিয়ে রয়েছেন। বুকের চালচলন দেখছেন—গতিবিধি লক্ষ্য করছেন—হতভাগাটা হার্টফেল করছে কিনা, খবর নিচ্ছেন নিজেই। আজ আর তাঁর খাওয়া-দাওয়ার কোনও বালাই নেই। পুজো বাড়ি থেকে প্রসাদী যেসব ফলমূল ফেরৎ আসছে, সেই সবই তিনি খেয়ে রয়েছেন। আসামাত্রই সেসব তিনি নিঃশেষ করছেন। দেবতার প্রসাদই তাঁর একমাত্র পথ্য আজ।

বিকেলের দিকটায় সারা বুকে তিনি ফ্ল্যানেলের ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে ফেললেন। কি জানি, হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যদি কিছু হয়ে যায়। কথায় বলে সাবধানের বিনাশ নেই। অবশ্যি সাধুর কথা কখনও মিথ্যা হবার নয়, না ফলেও যায় না—একেবারে অমোঘ। হরিহরবাবুর বিনাশ সুনিশ্চিত, সে বিষয়ে আর যারই সন্দেহ থাক, তাঁর নিজের কোনও সংশয় নেই কিন্তু তথাপি তিনি চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখবেন না—কোনও আফশোস নিয়ে মরা, তাঁর কুষ্ঠি-বিরুদ্ধ। কিন্তু নিজেকে নিয়ে এতটা বিব্রত থাকার মধ্যেই, সন্ধ্যার মুখে, হরিহরবাবুকে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়তে হল। আজ কদিন ধরেই, অনবরত, তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে কেবল তিনি চিঠি ছেড়েছেন—

"তোমরা পত্রপাঠ চলিয়া আইস; নচেৎ আমাকে আর দেখিতে পাইবা না। ইতি,—

মৃত্যুমুখে পতিত—
তোমাদের
শ্রীহরিহর চক্রবর্তী"

আজ সন্ধ্যে লাগতেই তাঁর বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনদের গাদি লেগে গেল! কাছে-পিঠে, দূরে-নিকটে, দেশ-বিদেশ থেকে, তাঁর কাকা জ্যাঠা, মাস্তুত ভাই, পিস্তুত বোন, ভাইপো, ভাইঝিরা সবাই শেষ দেখা দিতে এসে পড়ছে। হরিহরবাবু বুকে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ম্লানমুখে, তাঁদের অভ্যর্থনা করছেন, করুণকণ্ঠে তাদের কুশল-প্রশ্ন শুধাচ্ছেন। মৃত্যুর পূর্বদিনে, আজকে, তাঁর কাছে আত্মীয়রা আর শত্রু নয়—তাদের সমস্ত শত্রুতা, সব হিংসাদ্বেষ, যাবতীয় অপরাধ তিনি ভুলতে পেরেছেন। অন্ততঃ অকাতরে চেপে রাখতে পেরেছেন আজ। অবশেষে এল শনিবার—সেই মারাত্মক শনিবার—সেই সাংঘাতিক শনিবার এল সব শেষে।

আজ হরিহরবাবুর মুখে টুঁ শব্দটিও নেই। বুকে স্টেথিসকোপ লাগাতেও তিনি ভুলে গেছেন আজ। এমনিতেই, বিনা স্টেথিসকোপেই —এমনি কান পেতে মৃত্যুর পদশব্দ স্পষ্টই যেন তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন। ওষুধ-পথ্য সব আজ বন্ধ।

আত্মীয়স্বজনেরা সকলেই খুব উদ্বিগ্ন। পাছে, হরিহরবাবুর মৃত্যুতে কোনও বিঘ্ন ঘটে, ভারি শ্রাদ্ধটা মাটি হয়ে মাঠে মারা যায়, বেশি দূর না গড়ায়, ফসকে গিয়ে টসকে যায় কোনওগতিকে—সেই ভাবনাতেই সবাই কাহিল। সবাই প্রাণপণে তাঁর সদ্গতি চাইছে—আত্মার শান্তিকামনা করছে—তিনি মারা যাবার ঢের আগে থাকতে—এখন থেকেই।

তাঁর স্ত্রীপুত্রেরা এবং পুত্রের স্ত্রীরা সর্বদা তাঁর কাছে বসে রয়েছে। আত্মীয়দের ত কথাই নেই—মাছির মত তারা ছেঁকে রয়েছে। শুধু ডান হাতের সদ্ব্যবহারের জন্যেই কেবল যা তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে—তাঁকে মৃত্যুমুখে ফেলে রেখে, খুব দুঃখের সঙ্গেই, ক্ষণে ক্ষণে যা তাদের পাশের ঘরে যেতে হচ্ছে।

অনাত্মীয় বন্ধুবান্ধবরাও খবর পেয়ে বিছানার ধার ভিড় করে

এসে দাঁড়িয়েছে। খবরের কাগজের সংবাদদাতারা খবর না পেয়েই এসে গেছে। এমন কি ফটোগ্রাফাররাও শেষ স্ন্যাপ তুলবার জন্য ক্যামেরা নিয়ে হাজির, পাড়াপড়শিরাও অনুপস্থিত নয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, হরিহরবাবু মারা গেলেন না। শনিবার সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা,—একে একে সব কেটে গেলে, হরিহরবাবুর মরবার কিন্তু নামটি নেই। বন্ধুরা হতাশ হয়ে চলে গেল, পাড়াপড়শিরাও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সরে পড়ল—আত্মীয়স্বজনরাও ট্রেনে চেপে, দেশে ফিরবে কিনা, বেশ উচ্চকণ্ঠে ফিস ফিস করেই কানাঘুষা করতে লাগলেন। এই সব দেখেশুনে মরতে পারছেন না বলে হরিহরবাবু রীতিমত লজ্জিত হয়ে পড়লেন!

এইভাবে সারা রাত কাটল। শনিবারের সারা রাত! তারপর আবার আরেক রবিবার ঘুরে এল।

হরিহরবাবু ক্ষুণ্ণ মনে, অত্যন্ত সঙ্কোচে, বৈঠকখানায় নামলেন। সত্যি বলতে কি, লোক সমাজে মুখ দেখাতে তাঁর ভারি লজ্জা করছিল, এমন কি, এর চেয়ে, মারা গেলেই, এতক্ষণ গোলে হরিবোলের মধ্যে খাটিয়ায় চেপে কেওড়াতলার দিকে কেটে পড়তে পারলেই, মনে মনে তিনি যেন খুসি হতেন। কিন্তু হরিহরবাবু নাচার, মরণ তাঁর হাতধরা নয়—কি করেন তিনি?

ক্ষুব্ধচিত্তে হরিহরবাবু আবার সেই রোয়াকে গিয়ে বসলেন। সাতদিন আগের মত, আবার খবরের কাগজ হাতে নিলেন, একসঙ্গে সাত দিনের খবরের কাগজ।

এমন সময়ে সেই সন্ন্যাসী ফের এসে হাজির!

তাঁকে দেখবামাত্রই হরিহরবাবু রেগে আগুন! তাঁর ভেতরের যাবতীয় তেল আর বেগুন একসঙ্গে যেন জ্বলে উঠল। তিনি ছুটে তাকে মারতে গেলেন।

"ব্যাটা ভণ্ড কোথাকার! কোথায় আমি মারা গেলাম? য়্যাঁ? আমার এতনা লোকসান হল, এত টাকা জলে গেল আমার। আমাকে ঠকানো? বটে? এইভাবে আমাকে ফাঁকি দেওয়া? এখন আমি বেঁচে আছি, জলজ্যান্তই বেঁচে রয়েছি, আর মারা যাব কি না সন্দেহ! ছি ছি! জোচ্চোর, পাজি, বদমাইস—আমার নাম খারাপ করে দিলে—হারামজাদা কোথাকার!"

এই বলে তিনি সাধুবাবার দাড়ি ধরে ঝুলে পড়লেন। ঝুলে পড়তেই পাকাদাড়ি খুলে এল, এবং তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল তাঁর বহুদিনের পলাতক গুণধর—আর কে?

সেই ভাগ্নে!

পূজা কনসেশন



প্রবোধকুমার সান্যাল

পুজোর ছুটিতে হরিহরবাবু বিদেশে বেড়াতে যাবেন। আশি টাকার কেরানি, বিদেশে বড় একটা যাওয়া ঘটে না,—এত বড় সংসার, অতগুলি কাচ্ছা-বাচ্চা। তবু পুজো কনসেশন, সস্তায় টিকিট, হরিহরবাবু স্থির করলেন, বাবা বৈদ্যনাথ দর্শন করতে যাবেন।

বড়বাবুকে ধরে সাহেবকে ধরে পনের দিনের ছুটি পাওয়া গেল। যাবার অন্তত সাতদিন আগে থেকে তোড়জোড়। যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু, পরিচিত—সকলের কাছে চিঠি গেল। পাড়ার মুদির দোকান, কিনু স্যাকরা, কয়লাওয়ালা, ভৃগু পরামাণিক, নটবর ধোবা—ইত্যাদি সবাই জেনে গেল, হরিহরবাবু বিদেশে যাবেন। সাতদিন আগে থেকে হরিহরের ঘুম নেই, স্নানাহারের সময় নেই। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বচসা, বাড়ির লোকের সঙ্গে বিবাদ গিন্নির সঙ্গে মনোমালিন্য—তার কারণ তারা নাকি এতবড় একটা কাণ্ড-কারখানার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে না।

তিনি বললেন, কোন দিক সামলাই? আমি এত পেরে উঠব কেমন করে?

গিন্নি বললেন, কিসের এত হুড়োহুড়ি? এখনও ত অনেক দেরি!

দেরি! তোমার আর কি বল, আমার যে প্রাণ যায়। এত কেনাকাটা কে করবে?

কিসের কেনাকাটা?

শোনো কথা!—বলে হরিহরবাবু মেঝের উপর বসে পড়লেন। তিনি একে মোটা মানুষ, এতবড় ভুঁড়ি, গত বছরে অসুখ থেকে উঠেছেন, তার উপরে এই পরিশ্রম। মেয়েমানুষ, ওরা কি জানে, কতটুকু ওরা বোঝে, ওদের সাধ্য কতটুকু? যা করে সবই ত

এই শব্দ! হরিহরবাবু বললেন, তোমার মতন কুঁড়ে হলে আর রেলগাড়িতে উঠতে হচ্ছে না। এই বলে আবার তিনি ছুটলেন।

পথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে চললেন। চানাবাজার থেকে ছেলে-মেয়ের জুতো, হাওড়ার হাট থেকে সস্তায় কাপড়, মুর্গিহাটা থেকে গায়ের জামা, চাঁদনি থেকে দু খানা বিলেতি কম্বল। মোট ঘাট, বাজার চুপড়ি চ্যাঙারি—সবসুদ্ধ প্রকাণ্ড এক বস্তা তিনি এনে হাজির করলেন। বিদেশে বিভূঁয়ে যাবেন, সেখানে হয়ত ডাক্তার, বৈদ্য নেই, হয়ত রাত-বিরাতে কোনও বিপদ ঘটতে পারে, এজন্য তিনি ঔষধপত্র কিনতে সুরু করলেন। জ্বরের জন্য কুইনিন, আমাশয়ে ক্লোরোডাইন, কলেরায় ক্যাম্ফর, সর্দির ইউকালিপ্টস-অয়েল কাসির তালের মিছরি, কাটা-ছড়ার টিনচার-আইডিন, ঘায়ের বোরোফ্যাক্স, জামবাক ইত্যাদি। রাত্রে পথে বেরোবার জন্য একটা টর্চ-লাইট।

সেখানে গিয়ে একটা সংসার পাততে হবে তা মনে আছে? —হরিহর বললেন।

গিন্নি বললেন—সে ত হবেই।

তবে চুপ করে আছ কেন? আচ্ছা, তোমার কি একটুও দুশ্চিন্তা হচ্ছে না? জানো, সেই অজানা দেশে হয়ত কিছু পাওয়া যাবে না?

সে তখন দেখা যাবে।—বলে গিন্নি চলে গেলেন।

পরিশ্রমে হরিহর ঘর্মাক্ত, তবু তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না। ঠনঠনে থেকে তিনি এক প্রকাণ্ড চট কিনে আনলেন, তার সঙ্গে আনলেন একটা আমকাঠের বাক্স। তার মধ্যে থালা, বাটি, ঘটি, গেলাস, কড়া খুন্তি, হাতা, বেড়ি, চাটু, হাঁড়ি, গামলা, ডেকচি—সব পুরলেন। সাহায্য করবার কেউ নেই, একাই সব

করতে হল। এদিকে তেলের বাটি, নুনের কেঁড়ে, মশলার কৌটা, ঘিয়ের শিশি, শিল-নোড়া, চাকা-বেলুন, বঁটি-কাটারি—সব ঢোকালেন। অতদূর—বিদেশে চাল ভাল পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, সুতরাং তেল-ঘি-নুন-চাল-ডাল-লঙ্কা-হলুদ প্রভৃতি সমস্তই তিনি কিনে আনলেন। কারও কথা তিনি শুনতে রাজি নন, বিদেশের অভিজ্ঞতা বাড়ির কারও নেই। এখন সবাই মুখটিপে হাসছে বটে, কিন্তু সেই দুর্দিনে এইসব বড়ই মিষ্টি লাগবে। একসময় তিনি গলা বাড়িয়ে বললেন, বলি শুনছ, ছোট ছেলেটার জন্যে কিছু দুধ নিতে হবে, সে দেশে হয়ত গরু নেই।

গিন্নি বললেন, গরু একটা এখান থেকে নিয়ে গেলে হয় না?

বলেছ ঠিক।—বলে হরিহরবাবু মাথা নাড়লেন। যাই, স্টেশনে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করে আসি। বলেছ তুমি ঠিক।—তিনি গভীর চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

পাড়ার লোক ডেকে বললে, হরিহরবাবু, আপনার যাওয়া কি তবে ঠিক?

হরিহর বললেন, বাবা বদ্যিনাথের ইচ্ছে, আমার ত চেষ্টার ত্রুটি নেই।

কাল রাতে আপনার বাড়িতে অত গোলমাল হচ্ছিল কেন!

আর ভাই এতবড় ব্যাপার, কারও গা নেই। রাতজেগে আমি জিনিসপত্তর গোছাচ্ছিলুম।

আপনার বাড়িতে কারা এসেছিল?

হরিহর বললেন, ওঃ তা বটে। এসেছিল আমার দুই শালা, বড় ভায়রাভাই, আর আমার ভাগ্নে। তাদের ডেকেছিলুম চিঠি লিখে, ওরা সবাই সামনে এসে না দাঁড়ালে আমি এত পেরে উঠব কেন।

পাড়ার লোক বললে, আপনারা কজন যাবেন ?

আমি, আমার স্ত্রী আর তিনটি ছেলেমেয়ে। আচ্ছা দেখুন বিনয়বাবু, আপনি একবার আসুন ত আমার ঘরে। আমার মাথা আর ঠিক নেই, দেখে যান ত আর কিছু দরকার লাগতে পারে কিনা ?

বিনয়বাবু এসে দাঁড়ালেন। বললেন, সবই হয়েছে, বিছানা কিছু কম।

ওই শোনো, ওগো, কোথা গেলে ? আমি তখনই বললুম। ঠিক ঠিক, সামনে অক্টোবর মাস, বটেই ত !

সেদিন সমস্তদিন হরিহর বিছানাপত্র গোছালেন। লেপ চারটে বালিশ এগারোটা, কাঁথা ছ খানা, মাদুর তিনটে, তোষক পাঁচখানা চাদর সাতখানা, সতরঞ্চি তিনখান। এত বিছানা তাঁর নিজে ছিল না। শালা শালী, বড়বোন, মাসতুতো ভাই, মামা, পাশের বাড়ির বড় বৌ, বিনয়বাবুর স্ত্রী—সকলের কাছে পনেরো দিনের কড়ারে বিছানাগুলি ধার করে এনে তিনি এক জায়গায় স্তূপাকার করলেন। জিনিসপত্র, মোট-ঘাট, পোঁটলা-পুঁটলি চুপড়ি-চ্যাঙারি প্রভৃতিতে তাঁর শোবার ঘর বোঝাই হয়ে উঠল। রাত্রে ছেলেমেয়ে, স্ত্রীও নিজে ঘরে আর শোবার জায়গা পেলেন না, সকলকে বাইরে শুইয়ে দু দিন রাত কাটাতে হল। প্রথম শরৎকালের গুমোট, সুতরাং ঘরের ভিতরকার ঠাসাঠাসি জিনিসপত্রে আরশোলা, পিঁপড়ে, মাকড়সা, বিছে ইত্যাদির উৎপাতে দু দিন আগে থেকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা কঠিন হয়ে উঠল। নীচের দালান থেকে উপরের ঘর পর্যন্ত অসংখ্য পুঁটুলি, বস্তা, বাক্স, তোরঙ্গ, ব্যাগ, বিছানা, মোটঘাট— ইত্যাদিতেই আর পা বাড়াবার ঠাঁই রইল না। গরুর গাড়ি না হলে এত জিনিসপত্র স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাবে না।

অবশেষে হরিহরবাবু দু খানা গরুর গাড়ি বন্দোবস্ত করবার জন্য বেরুলেন।

ফিরে যখন এলেন দেখা গেল, আবার তাঁর সঙ্গে একগাড়ি জিনিসপত্র। সেই অজানা দেশে হয় ত খাবার জল পাওয়া যায় না, সুতরাং প্রকাণ্ড দুটো ট্যাঙ্ক এল। বড় একটিন কেরোসিন তেল, চোর ডাকাত তাড়াবার চারটে বড় বড় লাঠি, ছটা হারিকেন লণ্ঠন, তিনটে আলিগড়ের তালাচাবি, পাঁচটা বালতি, একরাশ খাম, পোষ্টকার্ড-ডাকটিকিট, হিসাবের বড় একখানা জাবেদা খাতা, গোটাকয়েক হুঁকো-কলকে-তামাক-টিকে, একরাশি দড়ি,— এমনি আরও কত কি। ধামা, চ্যাঙারি, থলে, বাক্স, ব্যাগ সমস্তই একে একে বোঝাই হয়ে উঠল।

পাড়ার বড় বৌ হরিহরের স্ত্রীকে ডেকে বললেন, এত জিনিসপত্র নিয়ে আপনারা কত দূরে যাবেন বৌদিদি ?

হরিহরের স্ত্রী হেসে বললেন, বিলেত !

অবশেষে যাবার দিন এল। বেলা বারোটায় ট্রেন, কিন্তু আগের রাত্রে হরিহর ঘুমালেন না। কেবল তাই নয়, পরদিন ভোরে জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা করার ভয় দেখিয়ে তিনি স্ত্রীকে জেগে থাকতে বললেন। ছেলেমেয়েদের চিমটি কেটে তিনি শেষরাত্রে ওঠালেন। গোলমাল ও চিৎকারে পাড়ার লোক সে রাত্রে জেগে কাটাল। ভোর-বেলায় একদল মুটে দুখান গরুর গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। সকালবেলা নানাদিক থেকে আত্মীয়-স্বজন তাঁর দরজায় উপস্থিত। পাড়ার লোক দল বেঁধে সারি সারি উপরের জানালায় ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেল।

সকালবেলা আহারাদির ব্যবস্থা যেমন-তেমন। ছেলেমেয়েদের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়ার অভাবে তারা দু দিন থেকে অযত্নে ও

অনাহারে কাহিল হয়ে পড়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর বিবাদ, বিদেশে যাওয়ার এইসব হাস্যকর আয়োজনে সাহায্য না করার জন্য হরিহর স্ত্রীর মুখ দেখছেন না। যাই হোক, কোন রকমে ভাতে-ভাত খেয়ে সেদিনের মত কাজ সারা হল।

কুলিদের সাহায্যে বেলা নয়টা নাগাদ হরিহর দু খানা গরুর গাড়িতে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে কপালে দইয়ের ফোঁটা এঁকে, সিদ্ধিদাতা গণেশের চরণ সেবা করে জয় দুর্গা শ্রীহরি বলে যাত্রা করলেন। যাবার সময় তাঁর ছোট শালাকে বললেন, আমি স্টেশনে গিয়ে জিনিসপত্র বুক করব, তুমি ভাই গিয়ে সকলের টিকিট কাটবে। দেখ, এগারোটার মধ্যে অবশ্য পৌছনো চাই, পূজা কনসেশনের ভিড়, দেরি হলে আর জায়গা পাবে না।

কালীপদ বললে, কোন ভয় নেই, আমি ঠিক নিয়ে যাব, আপনি যান।

সমস্ত পাড়া সচকিত ক'রে, সকলকে হাসিয়ে, সকলের বিস্মিত দৃষ্টির উপর দিয়ে বাবা বৈদ্যনাথ যাত্রী হরিহর চৌধুরী মশায় আর-একবার দুর্গা বলে যাত্রা করলেন। গাড়ি দু খানা পাড়ার ভিতর দিয়ে ঘটর-ঘটর করে চলতে লাগল, আর আমাদের হরিহরবাবু সেই সকল সবল জিনিসপত্রের উপরে বসে তাঁর নতুন কেনা গরুর গলার দড়িটা ধরে বসে রইলেন। গরুটা চলল গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে।

স্টেশনে এসে দেখা গেল গাড়ির দু ঘণ্টা দেরি। জিনিসপত্রের যথারীতি বিধি ব্যবস্থা করে হরিহর এক জায়গায় তাঁর স্তূপাকার মালপত্রের পাশে এসে বসলেন। ক দিন থেকে পরিশ্রমের শেষ নেই, রাত কাটে জেগে, তার ওপর মোটা মানুষ, এদিকে উপবাস চলেছে

—ক্লান্তিতে হরিহরের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। তিনি একটা বড় মোটের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। গাড়ির তখনও অনেক দেরি।

মাত্র কয়েক মিনিট আগে তাঁর ঘুম ভাঙল, তখন ঘণ্টা দিয়েছে। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে হাঁকাহাঁকি করতেই কুলি এল। দশজন কুলি। সেই দশজন মিলে তাঁর মালপত্র নিয়ে প্লাটফরম পেরিয়ে গাড়িতে তুললো! গাড়ি ছাড়তে আর বিলম্ব নেই। কিন্তু কই তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, তাঁর শ্যালকরা—তারা সব কোথায়? হরিহর আকুল হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। হে নারায়ণ মধুসূদন, তুমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

দুই একমিনিট মাত্র বাকি, এমন সময় তাঁর শালা ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। চিৎকার করে বললে, আপনি করেছেন কি নামুন, নামুন, এটা যে তারকেশ্বরের গাড়ি—শিগগীর, আর সময় নেই, দেওঘরের গাড়ি আর তিনমিনিট, আসুন, শিগগীর আসুন।

পাগলের মত হরিহর প্লাটফরমে ঝাঁপ দিলেন। কুলি, কুলি! শিগগীর মাল নামাও,—এই কুলি, কুলি!

আবার জিনিস-পত্র নামাতে হল।

পনের জন কুলি, পনের টাকা বকশিস। অনেক ভাঙল মচকাল, নষ্ট হল। চালের বস্তা ফাটল, তেলের টিন ফুটো হ জলের কলসি ভেঙে ছত্রখান হল।

দেওঘরের ট্রেন ছাড়তে তখন একমিনিট বাকি। ছুটতে গিয়ে বেচারি হরিহরের কাছা খুলে গেল। সেই অবস্থায় উদভ্রান্ত হয়ে উন্মত্ত হয়ে তিনি গাড়ি পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন। কুলিরা তখনও জিনিসপত্র এনে পৌঁছতে পারেনি। শ্যালক কেবল একটা বিছানা ও

একটা কাপড়ের স্যুটকেস হিঁচড়ে এনে গাড়িতে তুলে দিলে। স্ত্রী স্বামীর হাত ধরে গাড়িতে তাঁকে তুলে নিয়ে বললেন, মরণ তোমার, থাক সব, তুমি উঠে এস।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

হরিহর ফ্যাল ফ্যাল করে গলা বাড়িয়ে চেয়ে রইলেন। শ্যালকের হেপাজতে সমস্ত মালপত্র প্লাটফরমে পড়ে রইল।

